ইউসুফ

১২

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ও এর কারণসমূহ

এ সূরার বিষয়বস্তু থেকে একথা বুঝা যাচ্ছে যে, এটিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় অবস্থানের শেষ যুগে নাযিল হয়ে থাকবে। তখন কুরাইশের লোকেরা নবীকে (সা) হত্যা বা দেশান্তর করবে, না বন্দী করবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল। এ সময় মক্কার কাফের সমাজের কোন কোন লোক (সম্ভবত ইহুদীদের ইংগিতে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে প্রশ্ন করে, বনী ইসরাঈলরা কি কারণে মিসরে চলে গিয়েছিল? যেহেতু আরববাসীরা এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতো না, তাদের কথা–কাহিনী ও পৌরানিক বৃত্তান্তসমূহে কোথাও এর কোন উল্লেখই পাওয়া যেতো না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের মুখেও ইতিপূর্বে এ সম্পর্কিত কোন কথা শোনা যায়নি, তাই তারা আশা করছিল, তিনি এর কোন বিস্তারিত জবাব দিতে পারবেন না অথবা এ সময় টালবাহানা করে কোন ইহুদীকে জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করবেন এবং এভাবে তাঁর বুজরুকি ধরা পড়ে যাবে। কিন্তু এ পরীক্ষায় উলটো তারাই মার খেয়ে গেলো। আল্লাহ কেবল সংগে সংগেই ইউসুফ আলাইহিস সালামের এ ঘটনা সম্পূর্ণ তাঁর মুখ দিয়ে শুনিয়েই ক্ষান্ত হলেন না বরং এ ঘটনাকে কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে ব্যবহার করছিল ঠিক তার সদৃশ ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন।

নাযিলের উদ্দেশ্য

এক ঃ এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের প্রমাণ এবং তাও আবার বিরোধিদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা। এ সংগে তাদের স্থিরীকৃত পরীক্ষায় একথা প্রমাণ করে দেয়া যে, নবী শোনা কথা বলেন না বরং অহীর মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন। ৩ ও ৭ আয়াতে এ উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ১০২ ও ১০৩ আয়াতে পূর্ণ শক্তিতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দুই ঃ কুরাইশ সরদারদের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এ সময় যে দ্বন্দ্ব চলছিল তার ওপর ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের ঘটনা প্রয়োগ করে কুরাইশদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আজ তোমরা নিজেদের ভাইয়ের সাথে ঠিক তেমনি আচরণ করছো যেমন ইউসুফের ভাইয়েরা তাঁর সাথে করেছিলেন। কিন্তু যেমন তারা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত যাকে চরম নির্দয়ভাবে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো সেই ভাইয়ের পদতলেই নিজেদের সঁপে দিতে

হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কৌশল ও ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তোমাদের শক্তি প্রয়োগ সফল হতে পারবে না। একদিন তোমাদেরও নিজেদের এ ভাইয়ের কাছে দয়া ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হবে, যাকে আজ তোমরা খতম করে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছো। সূরার শুরুতে এ উদ্দেশ্যটিও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ

"ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনার মধ্যে এ প্রশ্নকারীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।"

আসলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ঘটনাকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরাইশদের দ্বন্দ্বের ওপর প্রয়োগ করে কুরআান মজীদ যেন একটি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী তাকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ করেছে। এ সূরাটি নাযিল হওয়ার দেড় দু'বছর পরই কুরাইশরা ইউসুফের ভাইদের মতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁকে বাধ্য হয়ে মক্কা থেকে বের হতে হয়। তারপর তাদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই দেশান্তরী অবস্থায়ই তিনি ঠিক তেমনি উন্নতি ও কর্তৃত্ব লাভ করেন যেমন ইউসুফ আলাইহিস সালাম করেছিলেন । তারপর মক্কা বিজয়ের সময় ঠিক সেই একই ঘটনা ঘটেছিল যা মিসরের রাজধানীতে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে তাঁর ভাইদের শেষ উপস্থিতির সময় ঘটেছিল। সেখানে যখন ইউসুফের ভাইয়েরা চরম অসহায় ও দীন হীন অবস্থায় তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে বলছিলেন ঃ

تَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ

"আমাদের প্রতি সাদ্‌কা করুন। আল্লাহ সাদকাকারীদেরকে উত্তম পুরস্কার দিয়ে থাকেন।"

তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রতিশোধ নেবার শক্তি রাখা সত্ত্বেও তাদেরকে মাফ করে দিলেন এবং বললেন ঃ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি সকল অনুগ্রহকারীর চাইতে বড় অনুগ্রহকারী।"

অনুরূপভাবে এখানে যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পরাজিত বিধ্বস্ত কুরাইশরা মাথা নত করে দাঁড়িয়েছিল এবং তিনি তাদের প্রত্যেকটি জুলুমের বদলা নেবার ক্ষমতা রাখতেন তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তোমারা কি মনে করো, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো?" তারা জবাব দিল ঃ اخ كريم وابن اخ كريم "আপনি একজন উদারচেতা ভাই এবং একজন উদারচেতা ভাইয়ের সন্তান।" একথায় তিনি বললেন ঃ

فانى اقول لكم كما قال يوسف لاخوته ، لا تثريب عليكم اليوم اذ هبوا فانتم الطلقاء –

"আমি তোমাদের সেই একই জবাব দিচ্ছি যে জবাব ইউসুফ তার ভাইদেরকে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যাও তোমাদের মাফ করে দিলাম।"

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ দু'টি বিষয় তো এ সূরার উদ্দেশ্যের পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এ কাহিনীটিকেও কুরআন মজীদ নিছক গল্প বলার ও ইতিহাস লেখার ঢংয়ে বর্ণনা করছে না বরং নিজের রীতি অনুসারে তাকে মূল দাওয়াত প্রচারে ব্যবহার করছে।

এ পুরো ঘটনাটিতে সে একথা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ইসহাক (আ), হযরত ইয়াকুব (আ) ও হযরত ইউসুফ (আ) সেই একই দীনের অনুসারী ছিলেন যে দীনের অনুসারী ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং যে দাওয়াত তিনি দিচ্ছেন সেই একই দাওয়াত তাঁরাও দিতেন।

তাছাড়া সে একদিকে হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র এবং অন্যদিকে ইউসুফের ভ্রাতৃবৃন্দ, বণিক দল, আযীযে মিসর, তার স্ত্রী, মিসরের অভিজাত পরিবারের নারী সমাজ ও শাসকদের কর্মকাণ্ড ও চরিত্র পরস্পরের মোকাবিলায় তুলে ধরছে এবং নিছক নিজের বর্ণনাভংগীর মাধ্যমে শ্রোতা ও পাঠকদের সামনে এ নীরব প্রশ্ন উপস্থাপন করছে যে, দেখো, একদিকে ইসলাম একটি আদর্শ চরিত্র পেশ করছে। আল্লাহর বন্দেগী ও আখেরাতে জবাবদিহির প্রতি বিশ্বাসের ভিত্তিতেই এ চরিত্র গড়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে রয়েছে আর একটি চরিত্র। কুফরী, জাহেলিয়াত, বৈষয়িক স্বার্থপূজা ও আখেরাতের সাথে সম্পর্কহীনতার ছাঁচে ঢালাই হয়ে এ চরিত্র তৈরী হয়। এখন তোমরা নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস করো, সে এর মধ্য থেকে কোন্ চারিত্রিক আদর্শটি পছন্দ করে?

তারপর এ ঘটনা থেকে কুরআন মজীদ আরো একটি গভীর তত্ত্বও মানুষের হৃদয়পটে অংকন করে দেয়। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ যে কাজ করতে চান তা যে কোন অবস্থায় সম্পাদিত হয়েই যায়। মানুষ নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কলাকৌশলের মাধ্যমে তাঁর পরিকল্পনা প্রতিহত করার বা বদলাবার ব্যাপারে কখনো সফল হতে পারে না। বরং অনেক সময় মানুষ নিজের পরিকল্পনার লক্ষে একটি কাজ করে এবং মনে করতে থাকে যে, সে তীরটি ঠিক নিশানায় মেরে দিয়েছে কিন্তু শেষে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ তারই হাত দিয়ে এমন কাজ করিয়ে নিয়েছেন যা ছিল তার নিজের পরিকল্পনার বিরোধী এবং আল্লাহর পরিকল্পনার পুরোপুরি বাস্তবায়ন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যখন তাঁকে কূয়ায় ফেলে দিচ্ছিলো তখন তারা মনে করছিলো আমরা নিজেদের পথের কাঁটা চিরতরে দূর করে দিচ্ছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা ইউসুফকে নিজেদের হাতে এমন এক উন্নতির প্রথম ধাপে চড়িয়ে দিয়েছিলো যার ওপর আল্লাহ তাঁকে চড়াতে চাচ্ছিলেন এবং এ কাজ

করে তারা নিজেরা যে ফল লাভ করেছে তা এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, ইউসুফের উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌছে যাবার পর তারা নিজের ভাইয়ের সাথে সসম্মানে সাক্ষাত করতে যাওয়ার পরিবর্তে লজ্জা ও অনুতাপের অনুভূতি সহকারে মাথা নত করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আযীযে মিসরের স্ত্রী ইউসুফকে কারাগারে পাঠিয়ে মনে করছিল সে প্রতিশোধ নিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে তার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌছার পথ পরিষ্কার করেছিল। আর নিজের এ কৌশলের মাধ্যমে সে নিজের জন্য এর চেয়ে বেশী কিছু অর্জন করতে পারেনি যে, যথার্থ কাজের সময়ে দেশের শাসকের স্ত্রী হিসেবে 'মুরব্বী'র সম্মান লাভ করার পরিবর্তে তাকে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য লজ্জায় অধোবদন হতে হয়। এসব নিছক দু'চারটে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং ইতিহাসের পাতা এমনি ধরনের অসংখ্য ঘটনায় ভরা। এগুলো এ সত্যটিরই সাক্ষ প্রদান করে যে, আল্লাহ যাকে ওপরে উঠাতে চান সারা দুনিয়ার লোকেরা মিলেও তাকে নিচে ফেলে দিতে পারে না। বরং দুনিয়ার লোকেরা তাকে নিচে ফেলে দেয়ার জন্য যে কৌশলটি অত্যন্ত কার্যকর ও নিশ্চিত মনে করে অবলম্বন করে সেই কৌশলের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তার ওপরে ওঠার পথ বের করে দেন এবং যারা তাকে নামাতে চেয়েছিল তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই থাকে না। অনুরূপভাবে এর ঠিক বিপরীতে আল্লাহ যাকে ভূপাতিত করতে চান কোন কৌশলই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে না। বরং দাঁড় করিয়ে রাখার যাবতীয় কার্যক্রম ও কৌশল উলটে যায় এবং এ ধরনের কৌশল অবলম্বনকারীকে ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়।

যে ব্যক্তি এ সত্যটি উপলব্ধি করবে সে প্রথমে এ শিক্ষা লাভ করবে যে, মানুষকে নিজের উদ্দেশ্য ও কলাকৌশল উভয় ক্ষেত্রে এমন সব সীমারেখা অতিক্রম করা উচিত নয় যা আল্লাহর আইনে তার জন্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। সাফল্য ও ব্যর্থতা অবশ্যি আল্লাহর হাতে। কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র উদ্দেশ্যে সরল সোজা ও বৈধ কলাকৌশল অবলম্বন করবে সে ব্যর্থ হয়ে গেলেও তাকে লাঞ্ছনা ও অপমানের সম্মুখীন হতে হবে না। আর যে ব্যক্তি অপবিত্র উদ্দেশ্যে বাঁকা কলাকৌশল অবলম্বন করবে সে আখেরাতে তো অবশ্যি অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবেই, দুনিয়াতেও তার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনার ভয় কিছু কম নেই। দ্বিতীয়ত সে এ থেকে লাভ করবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল এবং তাঁর প্রতি আত্মসমর্পিত হবার গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যারা সত্য ও সততার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং দুনিয়াবাসীরা তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা যদি এ সত্যটি সামনে রাখে তাহলে এ থেকে তারা দুর্লভ মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে এবং বিরোধী শক্তিবর্গের বাহ্যত অত্যন্ত ভয়াবহ কলাকৌশলসমূহ দেখে তারা মোটেই ভীত হবে না। বরং ফলাফল আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের নৈতিক দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকবে।

কিন্তু এ ঘটনাটি থেকে সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে এই যে, একজন মরদে মুমিন যদি সত্যিকার ইসলামী চরিত্রের অধিকারী হয় এবং সে বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার গুণেও গুণান্বিত হয় তাহলে নিছক নিজের চরিত্র বলে সে সারা দেশ জয় করতে পারে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারটি দেখুন। ১৭ বছর বয়সে একাকী সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিদেশ বিভূঁইয়ে তিনি একেবারেই অপরিচিত পরিবেশে, অধিকন্তু চরম দুর্বল অবস্থায় নিপতিত। কারণ তাঁকে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করা হয়। ইতিহাসের

সেই অধ্যায়ে গোলামদের যে অবস্থা ছিল তা কারো অজানা নেই। এর ওপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা স্বরূপ একটি মারাত্মক নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত করে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এখানে শাস্তির কোন মেয়াদ নির্ধারিত হয়নি। এভাবে তাঁকে একেবারে চরম পর্যায়ে নামিয়ে দেবার পরও তিনি নিছক নিজের ঈমান ও চরিত্র বলে উঠে দাঁড়ান এবং শেষ পর্যন্ত সারা দেশের ওপর বিজয়ী হন।

ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা

এ ঘটনাটি সঠিকভাবে বুঝতে হলে এ সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যও পাঠকদের সামনে থাকা উচিত।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ছিলেন হযরত ইয়াকূবের (আ) পুত্র, হযরত ইসহাকের পৌত্র এবং হযরত ইবরাহীমের প্রপৌত্র। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী (কুরআনের ইংগিত থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়) হযরত ইয়াকূবের চার স্ত্রী থেকে ছিল বারটি ছেলে। হযরত ইউসুফ (আ) ও বিন ইয়ামীন ছিলেন এক স্ত্রীর গর্ভজাত এবং বাকি দশজন অন্য স্ত্রীদের গর্ভজাত।

ফিলিস্তিনে হযরত ইয়াকূবের আবাস ছিল হিবরূন (বর্তমান আল খাইল) উপত্যকায়। এখানে হযরত ইসহাক (আ) এবং তাঁর পূর্বে হযরত ইবরাহীমও (আ) থাকতেন। এ ছাড়া সিক্‌কিমে (বর্তমান নাবলুস) হযরত ইয়াকূবের (আ) কিছু জমি ছিল।

বাইবেল বিশারদগণের গবেষণাকে সঠিক বলে ধরে নিলে হযরত ইউসুফের জন্ম খৃষ্টপূর্ব ১৯০৬ সালের কাছাকাছি সময়ে হয় বলে ধরা যায়। এ হিসেবে খৃষ্টপূর্ব ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সময়ে যে ঘটনাটি ঘটে অর্থাৎ স্বপ্ন দেখা এবং কূয়ায় নিক্ষিপ্ত হওয়া, এ থেকে এ ঘটনাটির সূত্রপাত হয়। এ সময় হযরত ইউসুফের বয়স ছিল ১৭ বছর। যে কূয়ায় তাঁকে ফেলে দেয়া হয় সেটি বাইবেল ও তালমূদের ভাষ্যমতে সিক্‌কিমের উত্তর দিকে দূতান (বর্তমানে দূসান) নামক স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। আর যে কাফেলাটি তাঁকে কূয়া থেকে উদ্ধার করে তারা জাল'আদ (পূর্ব জর্দান) থেকে আসছিল এবং মিসরের দিকে যাচ্ছিল। (জাল'আদের ধ্বংসাবশেষ আজো জর্দান নদীর পূর্ব দিকে ইলিয়াবিস উপত্যকার কিনারে পাওয়া যায়।)

এ সময় মিসরে পঞ্চদশতম রাজ পরিবারের শাসন চলছিল। মিসরের ইতিহাসে এ পরিবারটি রাখাল রাজন্যবর্গ (HYKSOS KINGS) নামে পরিচিত। এরা ছিল আরবীয় বংশজাত। খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার বছরের কাছাকাছি সময়ে এরা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া থেকে মিসরে গিয়ে দেশের শাসন কর্তৃত্ব দখল করেছিল। আরব ঐতিহাসিক ও কুরআনের তাফসীরকারগণ তাদের জন্য "আমালীক" নাম ব্যবহার করেছেন। মিসর সম্পর্কীয় আধুনিক অনুসন্ধান ও গবেষণার সাথে এটি পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। মিসরে এরা বিদেশী হানাদারের পর্যায়ভুক্ত ছিল এবং দেশে গৃহবিবাদের কারণে তারা সেখানে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল। এ কারণে তাদের রাজত্বে হযরত ইউসুফের (আ) উত্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং তারা বনী ইসরাঈলকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। দেশের

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সংক্রান্ত মানচিত্র
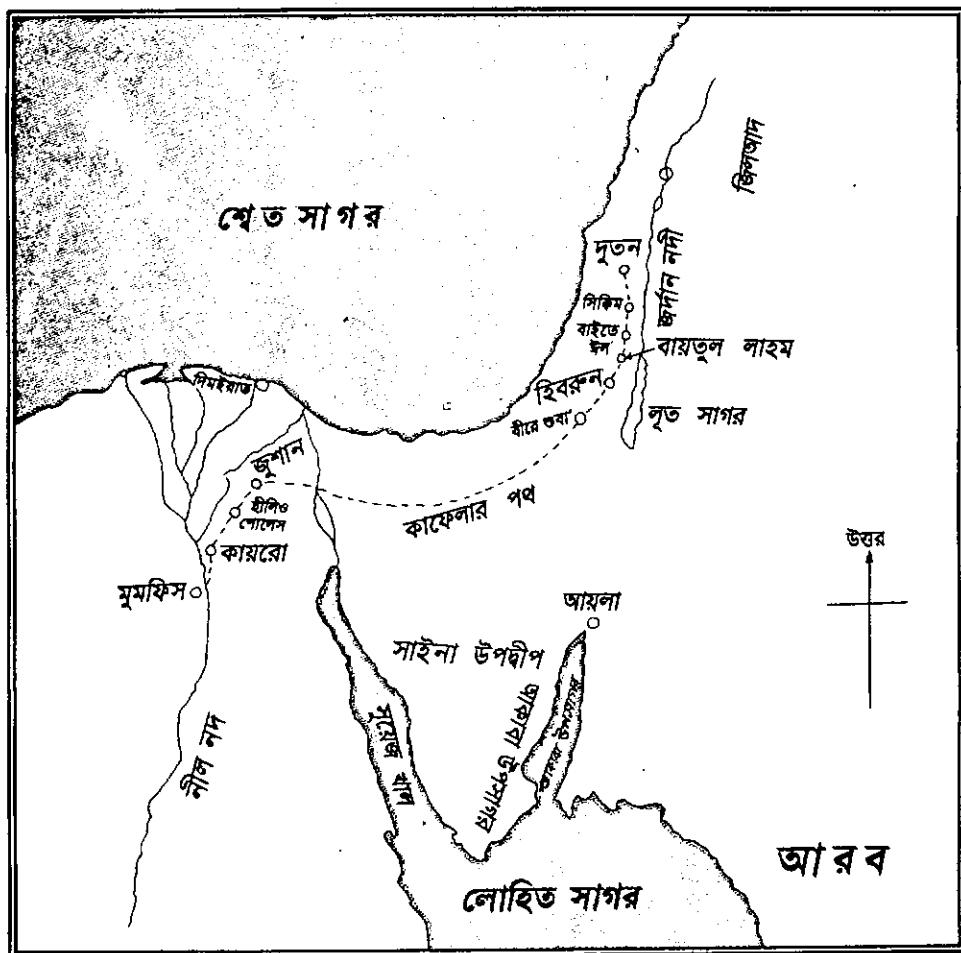
দুতন ঃ বাইবেলের মতে এ স্থানেই হযরত ইউসুফ কূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল।

সিক্কিম ঃ এখানে হযরত ইয়াকূবের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। বর্তমানে এর নাম নাবলূস।

হিবরুন ঃ এখানে হযরত ইয়াকূব বসবাস করতেন। এর আর এক নাম 'আল-খলীল।'

জুশান ঃ হযরত ইউসুফ এখানে বনী ইসরাঈলদেরকে পুনর্বাসিত করেন।

সবচেয়ে উর্বর এলাকা তাদের বসতি স্থাপন করার জন্য দেয়া হয়েছিল। সেখানে তারা বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েছিল। কারণ তারা ছিল বিদেশী শাসকদের সগোত্রীয়। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের শেষ অবধি তারা মিসর শাসন করতে থাকে। তাদের আমলে কার্যত দেশের যাবতীয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বনী ইসরাঈলদের হাতে ন্যস্ত থাকে। সূরা মায়েদার ২০ আয়াতে এ যুগের প্রতি ইংগিত করে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا এরপর দেশে একটি প্রবল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সৃষ্টি হয়। এর ফলে হিক্‌সুস (HYKSOS) শাসনের অবসান ঘটে। আড়াই লাখের মতো আমালিকাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। একটি চরম বিদ্বেষী কিবৃতী বংশোদ্ভূত পরিবার দেশের শাসন কর্তৃত্ব দখল করে। তারা আমালিকাদের আমলের প্রত্যেকটি স্মৃতি চিহ্ন খুঁজে খুঁজে বের করে এনে ধ্বংস করে দেয় এবং হযরত মূসার (আ) ঘটনা প্রসংগে বনী ইসরাঈলদের প্রতি যেসব অত্যাচারের কাহিনী উল্লেখিত হয়েছে তার ধারাবাহিকতার সূত্রপাত করে।

মিসরের ইতিহাস থেকে একথাও জানা যায় যে, এ রাখাল বাদশাহরা মিসরীয় দেবতাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। তারা সিরিয়া থেকে নিজেদের দেবতা সংগে করে এনেছিল। মিসরে নিজেদের ধর্মের প্রসারে তারা প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এ কারণে কুরআন মজীদ হযরত ইউসুফের সমকালীন মিসর সম্রাটকে "ফেরাউন" নামে উল্লেখ করছে না। কারণ ফেরাউন ছিল মিসরের ধর্মীয় পরিভাষা এবং এরা মিসরীয় ধর্মের প্রবক্তা ছিল না। কিন্তু বাইবেলে ভুলক্রমে তাকেও "ফেরাউন" বলা হয়েছে। সম্ভবত বাইবেল সংকলকগণ মনে করতেন যে, মিসরের সব বাদশাহই "ফেরাউন" ছিল।

বর্তমান যুগের অনুসন্ধানী ও গবেষকগণ বাইবেল ও মিসরীয় ইতিহাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তারা সাধারণভাবে এ অভিমত পোষণ করেন যে, মিসরের ইতিহাসে রাখাল বাদশাহদের মধ্যে আপোফিস (APOPHIS) নামক বাদশাহই ছিলেন হযরত ইউসুফের সমসাময়িক।

এ সময় মমফিস (মনফ) ছিল মিসরের রাজধানী। কায়রোর দক্ষিণে ১৪ মাইল দূরে এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। হযরত ইউসুফ (আ) ১৭/১৮ বছর বয়সে সেখানে পৌঁছেন। দু'তিন বছর আযীযে মিসরের বাড়িতে থাকেন। আট নয় বছর কারাগারে বাস করেন। ৩০ বছর বয়সে দেশের শাসক নিযুক্ত হন। ৮০ বছর বয়স পর্যন্ত একচ্ছত্রভাবে সমগ্র মিসর শাসন করতে থাকেন। তাঁর শাসনকালের নবম বা দশম বছরে তিনি হযরত ইয়াকূবকে (আ) তাঁর সমগ্র পরিবার পরিজনসহ ফিলিস্তিন থেকে মিসরে নিয়ে আসেন। তাদেরকে দিমীয়াত ও কায়রোর মাঝামাঝি এলাকায় আবাদ করেন। বাইবেলে এ এলাকার নাম জুশান বা গুশান বলা হয়েছে। হযরত মূসার (আ) আমল পর্যন্ত তারা সেখানেই বসবাস করতো। বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফ একশো দশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি বনী ইসরাঈলকে অসিয়াত করে যান, তোমরা যখন এ দেশ ত্যাগ করবে তখন আমার হাড়গুলো সংগে করে নিয়ে যাবে।

বাইবেলে ও তালমূদে ইউসূফ আলাইহিস সালামের ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে কুরআনের বর্ণনা তা থেকে অনেকটা ভিন্নতর। কিন্তু ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ অংশে তিনটি বর্ণনাই একাত্ম। আমার ব্যাখ্যা ও টীকাগুলোতে আমি প্রয়োজনমতো এ পার্থক্য সুস্পষ্ট করে যেতে থাকবো।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝١ اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٢ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝٣ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ ۝٤

আলিফ–লাম–র। এগুলো এমন কিতাবের আয়াত যা নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে। আমি একে আরবী ভাষায় কুরআন বানিয়ে নাযিল করেছি,[১] যাতে তোমরা (আরববাসীরা) একে ভালোভাবে বুঝতে পারো।[২] হে মুহাম্মাদ! আমি এ কুরআনকে তোমার কাছে অহীর মাধ্যমে পাঠিয়ে উত্তম পদ্ধতিতে ঘটনাবলী ও তত্ত্বকথা তোমার কাছে বর্ণনা করছি। নয়তো ইতিপূর্বে তুমি (এসব জিনিস থেকে) একেবারেই বেখবর ছিলে।[৩]

এটা সেই সময়ের কথা, যখন ইউসুফ তার বাপকে বললো ঃ "আব্বাজান! আমি স্বপ্ন দেখেছি, এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চাঁদ আমাকে সিজদা করছে।"

১. قران হচ্ছে قَرَاء ক্রিয়াপদের শব্দমূল। এর আসল মানে হচ্ছে 'পড়া', শব্দমূলকে যখন কোন জিনিসের জন্য নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তার অর্থ হয় সংশ্লিষ্ট জিনিসটির মধ্যে তার শব্দমূলের অর্থ পুরোপুরি পাওয়া যায়। যেমন যখন কোন ব্যক্তিকে বীর বলার পরিবর্তে 'বীরত্ব' বলা হবে তখন তার মানে হবে, তার মধ্যে সাহসিকতা ও বীর্যবত্তা এমন পূর্ণাংগ পর্যায়ে পাওয়া যায় যেন সে এবং বীরত্ব একই জিনিস হয়ে গেছে। কাজেই এ কিতাবের নাম 'কুরআন' (পড়া) রাখার অর্থ হচ্ছে এই যে, এ কিতাব সাধারণ ও অসাধারণ নির্বিশেষে সকলের পড়ার জন্য এবং খুব বেশী বেশী করে পঠিত হবার জিনিস।

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

জবাবে তার বাপ বললো ঃ "হে পুত্র! তোমার এ স্বপ্ন তোমার ভাইদেরকে শুনাবে না; শুনালে তারা তোমার ক্ষতি করার জন্য পেছনে লাগবে।[৪] আসলে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু এবং ঠিক এমনটিই হবে (যেমনটি তুমি স্বপ্নে দেখেছো যে,) তোমার রব তোমাকে (তাঁর কাজের জন্য) নির্বাচিত[৫] করবেন এবং তোমাকে কথার মর্মমূলে পৌঁছানো শেখাবেন[৬] আর তোমার প্রতি ও ইয়াকূবের পরিবারের প্রতি তাঁর নিয়ামত ঠিক তেমনিভাবে পূর্ণ করবেন যেমন এর আগে তিনি তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি করেছেন। নিসন্দেহে তোমার রব সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।"[৭]

২. এর মানে এ নয় যে, এ কিতাবটি বিশেষভাবে আরববাসীদের জন্য নাযিল করা হয়েছে। বরং এ বাক্যাংশটির আসল বক্তব্য হচ্ছে, "হে আরববাসীরা! এসব কথা তোমাদের ইরানী ও গ্রীক ভাষায় শুনানো হচ্ছে না, তোমাদের নিজেদেরই ভাষায় শুনানো হচ্ছে। কাজেই তোমরা এ ওজর পেশ করতে পারো না যে, এসব কথা তো আমরা বুঝতে পারছি না। আর এ কিতাবে অলৌকিকতার যে দিকগুলো রয়েছে, যা এর আল্লাহর বাণী হওয়ার সাক্ষ দিচ্ছে, সেগুলোও যে তোমাদের দৃষ্টির আগোচরে থেকে যাবে, এটাও সম্ভব নয়।"

কেউ কেউ কুরআন মজীদে এ ধরনের বাক্য দেখে আপত্তি করে থাকেন যে, এ কিতাব তো আরববাসীদের জন্য নাযিল হয়েছে, অনারবদের জন্য নয়। এ ক্ষেত্রে একে সমগ্র মানব জাতির জন্য হেদায়াত কেমন করে বলা যেতে পারে? কিন্তু এটি নিছক একটি হালকা ও ফাঁকা আপত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল সত্য উপলব্ধি করার চেষ্টা না করেই এ আপত্তি উত্থাপন করা হয়। মানব জাতির ব্যাপক ও সার্বজনীন হেদায়াতের জন্য যে জিনিসই পেশ করা হবে তা অবশ্যি মানব সমাজে প্রচলিত ভাষাগুলোর যে কোন একটিতেই পেশ করা হবে। এ হেদায়াত পেশকারী এটিকে যে জাতির ভাষায় পেশ করছেন প্রথমে তাকে এর শিক্ষাবলী দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন। তারপর এ জাতিই অন্যান্য জাতির কাছে এর শিক্ষা পৌঁছাবার মাধ্যমে পরিণত হবে। কোন দাওয়াত ও আন্দোলনকে আন্তরজাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত করার জন্য এটিই একটি বাস্তব ও স্বাভাবিক পদ্ধতি।

৩. সূরার ভূমিকায় আমি একথা বর্ণনা করে এসেছি যে, মক্কার কাফেরদের কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরীক্ষা করার বরং তাদের মতে তাঁর

মুখোশ খুলে দেবার জন্য সম্ভবত ইহুদীদের ইংগিতে তাঁকে হঠাৎ এ প্রশ্ন করে বসেছিল যে, বনী ইসরাঈলদের মিসরে চলে যাওয়ার কারণ কি ছিল? এ কারণে তাদের প্রশ্নের জবাবে বনী ইসরাঈলদের ইতিহাসের এ অধ্যায় বর্ণনা করার আগে ভূমিকা স্বরূপ একথা বলে দেয়া হলো। হে মুহাম্মাদ! তুমি এসব ঘটনা জানতে না, আমি অহির মাধ্যমে তোমাকে তাদের কথা জানাচ্ছি। আপাতদৃষ্টে এ বাক্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু আসলে এখানে এমন সব বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখা হয়েছে যারা অহীর মাধ্যমে নবী (সা) যে সঠিক জ্ঞান লাভ করেন একথা বিশ্বাস করতো না।

৪. এখানে হযরত ইউসুফের (আ) দশজন বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ) জানতেন এ বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ইউসুফকে (আ) হিংসা করে। নৈতিক দিক দিয়েও তারা এমন পর্যায়ের সচ্চরিত্র ছিল না যে, নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কোন অবৈধ কাজ করতে কুণ্ঠিত হবে। তাই তিনি নিজের সদাচারী পুত্রকে বলে দিলেন, তাদের থেকে সাবধান থেকো। স্বপ্নের পরিষ্কার অর্থ ছিল এই ঃ সূর্য মানে হযরত ইয়াকূব (আ), চাঁদ মানে তাঁর স্ত্রী (হযরত ইউসুফের বিমাতা) এবং এগারটি তারকা মানে এগারটি ভাই।

৫. অর্থাৎ নবুওয়াত দান করবেন।

৬. تاويل الاحاديث মানে নিছক স্বপ্নের তাবীরের জ্ঞান নয়, যেমন মনে করা হয়ে থাকে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাকে সমস্যা ও পরিস্থিতি অনুধাবন করার এবং সত্য পর্যন্ত পৌঁছুবার জ্ঞান দান করবেন। আর এ সংগে এমন গভীর অন্তরদৃষ্টি দান করবেন যার মাধ্যমে তুমি প্রত্যেকটি বিষয়ের গভীরে নামার এবং তার তলদেশে পৌঁছে যাবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

৭. বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা কুরআনের এ বর্ণনা থেকে ভিন্নতর। তাদের বর্ণনা হচ্ছে, হযরত ইয়াকূব স্বপ্নের বর্ণনা শুনে ছেলেকে খুব ধমক দেন এবং তাকে বলেন ঃ "আচ্ছা, এখন তাহলে এ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছো যে, আমি, তোমার মা ও তোমার সব ভাইয়েরা তোমাকে সিজদা করবো।" কিন্তু একটু চিন্তা করলে সহজেই একথা উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা নয় বরং কুরআনের বর্ণনাটিই হযরত ইয়াকূবের নবীসুলভ চরিত্রের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। হযরত ইউসুফ নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন, নিজের আকাংখা ও অভিলাষ ব্যক্ত করেননি। স্বপ্ন যদি সত্য হয়ে থাকে এবং বলা বাহুল্য যে, হযরত ইয়াকূব তার যে তাবীর করেছিলেন তা সত্য স্বপ্ন মনে করেই করেছিলেন, তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, এটা ইউসুফ আলাইহিস সালামের আকাংখা ছিল না বরং আল্লাহর তকদীরের ফায়সালা ছিল যে, এক সময় তিনি উন্নতির এহেন উচ্চ শিখরে আরোহণ করবেন। এ ক্ষেত্রে একজন নবী তো দূরের কথা একজন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও কি এরূপ আচরণ করতে পারেন? এ ধরনের কথায় কি তিনি অসন্তুষ্ট হতে এবং যে স্বপ্ন দেখেছে উলটো তাকে ধমক দিতে পারেন? কোন ভদ্র পিতাও কি এমন হতে পারেন যে, নিজের পুত্রের ভবিষ্যত উন্নতির সুখবর শুনে খুশী হবার পরিবর্তে তিনি উলটো বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হবেন?

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾

২ রুকূ'

আসলে ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনার মধ্যে এ প্রশ্নকারীদের জন্য বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। এ ঘটনা এভাবে শুরু হয় ঃ তার ভাইয়েরা পরস্পর বলাবলি করলো, "এ ইউসুফ ও তার ভাই,[৮] এরা দু'জন আমাদের বাপের কাছে আমাদের সবার চাইতে বেশী প্রিয়, অথচ আমরা একটি পূর্ণ সংঘবদ্ধ দল। সত্যি বলতে কি আমাদের পিতা একেবারেই বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।[৯] চলো আমরা ইউসুফকে মেরে ফেলি অথবা তাকে কোথাও ফেলে দেই, যাতে আমাদের পিতার দৃষ্টি কেবল আমাদের দিকেই ফিরে আসে। এ কাজটি শেষ করে তারপর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।"[১০]

৮. এখানে হযরত ইউসুফের সহোদর ভাই বিন ইয়ামীনের কথা বলা হয়েছে। এ ভাইটি তাঁর থেকে কয়েক বছরের ছোট ছিল। তার জন্মের সময় তার মায়ের ইন্তিকাল হয়। এ কারণে হযরত ইয়াকূব এ দু'টি মাতৃহীন সন্তানের প্রতি একটু বেশী নজর দিতেন। এ ছাড়াও এ স্নেহের আর একটি কারণ ছিল এই যে, তাঁর সব ছেলের মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসুফই এমন ছিলেন যার মধ্যে তিনি সৌভাগ্য ও সত্য সঠিক পথের সন্ধান লাভের লক্ষণ দেখেছিলেন। হযরত ইউসুফের স্বপ্নের কথা শুনে তিনি যাকিছু বলেছিলেন ওপরে তার যে বর্ণনা এসেছে তা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তিনি নিজের এ ছেলেটির অসাধারণ যোগ্যতা সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই জানতেন। অন্যদিকে সামনের দিকে যেসব ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে তা থেকে তাঁর বাকি দশ ছেলের চারিত্রিক মান সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কোন সৎব্যক্তি এ ধরনের সন্তানদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন একথা কেমন করে আশা করা যেতে পারে? কিন্তু বাইবেলের বর্ণনায় অবাক হতে হয়। সেখানে ইউসুফের প্রতি তাঁর ভাইদের হিংসার এমন একটি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে উল্টো হযরত ইউসুফই দোষী সাব্যস্ত হন। বাইবেলের বর্ণনা মতে হযরত ইউসুফ তাঁর পিতার কাছে ভাইদের বিরুদ্ধে চুগলখোরী করতেন। এ কারণে তাঁর ভাইয়েরা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।

৯. এ বাক্যটির মর্ম উপলব্ধি করার জন্য বেদুইনদের গোত্রীয় জীবনের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সেখানে কোন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা থাকে না। স্বাধীন উপজাতিরা

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فٰعِلِينَ ﴿١٠﴾ قَالُوا يٰٓأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنٰصِحُونَ ﴿١١﴾ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُونَ ﴿١٢﴾

এ কথায় তাদের একজন বললো, "ইউসুফকে মেরে ফেলো না। যদি কিছু করতেই হয় তাহলে তাকে কোন অন্ধ কূপে ফেলে দাও, আসা–যাওয়ার পথে কোন কাফেলা তাকে তুলে নিয়ে যাবে।" (এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে) তারা তাদের বাপকে গিয়ে বললো, " আব্বাজান! কি ব্যাপার, আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের ওপর ভরসা করেন না? অথচ আমরা তার সত্যিকার শুভাকাংখী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে কিছু ফলমূল খাবে এবং দৌড়ঝাঁপ করে মন চাংগা করবে। আমরা তার হেফাজত করবো।"[১১]

পরস্পর পাশাপাশি বসবাস করে। সেখানে কোন ব্যক্তির বিপুল সংখ্যক ছেলে, নাতি–পুতি, ভাই, ভাতিজা ইত্যাদির ওপর তার ক্ষমতা নির্ভর করে। তার ধন–প্রাণ, ইজ্জত–আবরু রক্ষার প্রয়োজনে তারা তাকে সাহায্য করে। এ ধরনের অবস্থায় মেয়েদের ও শিশুদের তুলনায় স্বাভাবিকভাবে জোয়ান ছেলেরাই মানুষের কাছে বেশী প্রিয় হয়। কারণ দুশমনের সাথে মোকাবিলায় তারা সাহায্য করতে পারে। এ কারণে ইউসুফের ভাইয়েরা বললো, বুড়ো বয়সে আমাদের বাপ দিশেহারা হয়েছে। আমাদের মতো দলবদ্ধ এ যুবক ছেলেরা, যারা খারাপ সময়ে তাঁর কাজে লাগতে পারে, তাঁর কাছে ততটা প্রিয় নয় যতোটা এ ছোট ছোট ছেলে দু'টি যারা তাঁর কোন কাজে লাগতে পারে না বরং উলটো তাদেরকেই হেফাজত করতে হবে।

১০. যারা নিজেদেরকে প্রবৃত্তির কামনা বাসনার হাতে সোপর্দ করে দেবার সাথে সাথে ঈমানদারী ও সততার সাথেও কিছুটা সম্পর্ক রেখে চলে এ বাক্যটির মধ্যে তাদের মানসিকতার একটি চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে। এ ধরনের লোকদের রীতি হচ্ছে, যখনই প্রবৃত্তি তাদের কাছে কোন খারাপ কাজ করার তাগিদ দেয় তখনই ঈমানের তাগিদ মুলতবি রেখে তারা প্রথমে প্রবৃত্তির তাগিদ পূর্ণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। এ সময় বিবেক ভেতর থেকে দংশন করতে থাকলে তাকে এ বলে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে যে, একটুখানি সবর করো, এ অনিবার্য গুনাহটি না করলে আমার কাজ আটকে থাকে, কাজেই এটা করে নিতে দাও, তারপর ইনশাআল্লাহ তাওবা করে আমি তেমনি সৎ হয়ে যাবো যেমনটি তুমি আমাকে দেখতে চাও।

১১. এ বর্ণনাটিও বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা থেকে ভিন্ন ধরনের। তাদের বর্ণনা হচ্ছে, ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের পশু চরাতে সিক্‌কিমের দিকে গিয়েছিল। হযরত ইয়াকূব

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ﴿١٣﴾ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ ﴿١٤﴾ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

বাপ বললো, "তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, এটা আমাকে কষ্ট দেবে এবং আমার আশংকা হয়, তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে এবং নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে।" তারা জবাব দিল, "যদি আমাদের সংঘবদ্ধ দল থাকতে তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা হবো বড়ই অকর্মন্য।" এভাবে চাপ দিয়ে যখন তারা তাকে নিয়ে গেলো এবং সিদ্ধান্ত করলো তাকে একটি অন্ধ কূপে ফেলে দেবে তখন আমি ইউসুফকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম, "এক সময় আসবে যখন তুমি তাদেরকে তাদের এ কৃতকর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। তাদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে তারা জানে না"১২

নিজেই তাদের সন্ধানে হযরত ইউসুফকে তাদের পেছনে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু একথা কল্পনাই করা যায় না যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে তার ভাইদের হিংসার কথা জানা সত্ত্বেও তাঁকে নিজের হাতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবেন। তাই কুরআনের বর্ণনাই অধিকতর বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়।

১২. মূল ইবারতে وهم لا يشعرون বাক্য এমনভাবে এসেছে যার ফলে তার তিনটি অর্থ হয় এবং তিনটি অর্থই এখানে মানানসই বলে মনে হয়। একটি অর্থ হচ্ছে, আমি ইউসুফকে এ সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম এবং তার ভাইয়েরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল যে, তাকে অহীর মাধ্যমে সবকিছু জানানো হচ্ছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তুমি এমন অবস্থায় তাদের এ কর্ম সম্পর্কে তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে যেখানে তোমার অবস্থানের ব্যাপারটি তারা কল্পনাও করতে পারবে না। তৃতীয় অর্থটি হচ্ছে, আজ এরা না জেনে বুঝে একটি কাজ করছে এবং ভবিষ্যতে এর ফলাফল কি হবে তা এরা জানে না।

এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যে কি সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল বাইবেল ও তালমূদে এর কোন উল্লেখ নেই। বিপরীত পক্ষে তালমূদে যে বর্ণনা এসেছে তা হচ্ছে এই যে, ইউসুফকে যখন কূপে ফেলে দেয়া হলো তখন তিনি জোরে জোরে কাঁদতে থাকলেন এবং চিৎকার করে ভাইদের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কুরআনের বর্ণনা পড়লে মনে হবে এমন এক যুবকের কথা বলা হচ্ছে যিনি আগামীতে ইতিহাসের মহান ব্যক্তিদের অন্তরভুক্ত হবেন। অন্যদিকে তালমূদ পড়লে যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠবে তা হচ্ছে এই যে, জনমানবশূন্য বিয়াবনে কয়েকজন বদ্দু একটি বালককে কূপের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে এবং এ সময় একজন সাধারণ বালক যা করে সে–ও তাই করছে।

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴿١٧﴾ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

রাতে তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের বাপের কাছে এসে বললো, "আব্বাজান! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসূফকে আমাদের জিনিসপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, ইতিমধ্যে নেকড়েবাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী।" তারা ইউসূফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের বাপ বললো, "বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি সবর করবো এবং খুব ভালো করেই সবর করবো।[১৩] তোমরা যে কথা সাজাচ্ছো তার ওপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।"[১৪]

১৩. কুরআনের ইবারতে صَبْرٌ جَمِيلٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাব্দিক অনুবাদ "ভালো সবর" হতে পারে। এর অর্থ হয় এমন সবর যার মধ্যে অভিযোগ, ফরিয়াদ, ভয়–ভীতি ও কান্নাকাটি নেই। একজন উচ্চ ও প্রশস্ত হৃদয়বত্তার অধিকারী মানুষের ওপর যে বিপদ আসে তাকে ধীর স্থির চিত্তে বরদাশত করে যাওয়াই এ সবরের প্রকৃতি।

১৪. বাইবেল ও তালমূদ এখানে হযরত ইয়াকূবের প্রতিক্রিয়ার এমন ছবি এঁকেছে যা যে কোন সাধারণ বাপের প্রতিক্রিয়া থেকে কোন অংশেই ভিন্নতর নয়। বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, "তখন ইয়াকূব নিজের জামা ফেড়ে ফেলেন, নিজের কোমরের সাথে চট জড়িয়ে নেন এবং বহুদিন পর্যন্ত ছেলের জন্য মাতম করতে থাকেন।" তালমূদে বলা হয়েছে, "ইয়াকূব ছেলের জামা চিনতে পেরেই উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ নিথর–নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকেন। তারপর উঠে বিকট জোরে চিৎকার দিয়ে বলেন, হাঁ এ আমার ছেলের জামা। এরপর তিনি বছরের পর বছর ধরে ইউসূফের জন্য মাতম করতে থাকেন।"

এ বর্ণনায় হযরত ইয়াকূবকে ঠিক তেমনটি করতে দেখা যাচ্ছে যেমনটি এ অবস্থায় প্রত্যেক বাপ করে থাকে। কিন্তু কুরআন এর যে বর্ণনা দিয়েছে তা আমাদের সামনে একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছবি তুলে ধরেছে। এ ব্যক্তি আপাদমস্তক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। এতবড় শোকাবহ ও হৃদয়বিদারক খবর শুনেও তিনি নিজের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

ওদিকে একটি কাফেলা এলো। তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে পানি নেবার জন্য পাঠালো। সে কূয়ার মধ্যে পানির ডোল নামিয়ে দিল। সে (ইউসুফকে দেখে) বলে উঠলো, "কী সুখবর! এখানে তো দেখছি একটি বালক।" তারা তাকে পণ্য দ্রব্য হিসেবে লুকিয়ে ফেললো। অথচ তারা যা কিছু করছিল সে সম্পর্কে আল্লাহ অবহিত ছিলেন। শেষে তারা তাকে সামান্য দামে কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল।[১৫] আর তার দামের ব্যাপারে তারা বেশী আশা করছিল না।

হারিয়ে ফেলছেন না। প্রখর বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পরিস্থিতির সঠিক চেহারা অনুমান করতে পারছেন। তিনি বুঝতে পারেন এটা একটা বানোয়াট কথা। তাঁর হিংসুটে ছেলেরা ঘটনাটা সাজিয়ে তাঁর সামনে পেশ করেছে। তারপর বিশাল হৃদয় ব্যক্তিদের মতো তিনি সবর করেন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করেন।

১৫. ঘটনাটা সহজভাবে বলতে গেলে এরূপ বলা যায় যে, ইউসুফের ভাইয়েরা হযরত ইউসুফকে কূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে যায়। পরে কাফেলার লোকজন এসে তাকে সেখান থেকে বের করে আনে। তারা তাকে মিসরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, ইউসুফের ভাইয়েরা পরে ইসমাঈলীদের একটি কাফেলা দেখে ইউসুফকে কূয়া থেকে বের করে তাদের হাতে বিক্রি করে দিতে চায়। কিন্তু তার আগেই মাদয়ানের সওদাগর তাকে কূয়া থেকে বের করে ফেলে। এ সওদাগরেরা বিশ দিরহামে ইউসুফকে ইসমাঈলীদের হাতে বিক্রি করে দেয়। সামনের দিকে গিয়ে বাইবেল লেখকরা একথা ভুলে যান যে, ইতিপূর্বে তারা ইউসুফকে ইসমাঈলীদের হাতে বিক্রি করে দিয়ে এসেছেন। তাই তারা ইসমাঈলীদের পরিবর্তে আবার মাদয়ানের সওদাগরদের দ্বারা তাঁকে মিসরীয়দের হাতে বিক্রি করাচ্ছেন। (দেখুন, আদি পুস্তক ৩৭ঃ২৫–২৮ এবং ৩৬) অন্যদিকে তালমূদের বর্ণনা হচ্ছে, মাদয়ানের সওদাগরেরা ইউসুফকে কূয়া থেকে বের করে এনে নিজেদের গোলামে পরিণত করে। তারপর ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফকে তাদের হাতে দেখে তাদের সাথে ঝগড়া করতে থাকে। অবশেষে তারা বিশ দিরহাম মূল্য পরিশোধ করে ইউসুফের ভাইদেরকে রাজি করে। তারপর তারা বিশ দিরহামের বিনিময়েই ইউসুফকে ইসমাঈলীদের হাতে বিক্রি করে। আর ইসমাঈলীরা মিসরে গিয়ে তাকে বিক্রি করে। এখান থেকেই মুসলমানদের মধ্যে এ বর্ণনার প্রচলন হয়েছে যে, ইউুফের ভাইয়েরা ইউসুফকে বিক্রি করে। কিন্তু জানা উচিত, কুরআন এ সমস্ত বর্ণনা সমর্থন করেনি।

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن
يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

৩ রুকূ'

মিসরে যে ব্যক্তি তাকে কিনেছিল[১৬] সে তার স্ত্রীকে[১৭] বললো, "একে ভালোভাবে রাখো, বিচিত্র নয় সে আমাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে অথবা আমরা তাকে পুত্র বানিয়ে নেবো।[১৮] এভাবে আমি ইউসুফের জন্য সে দেশে প্রতিষ্ঠালাভের পথ বের করে দিলাম এবং তাকে সমস্যা ও বিষয়াবলী অনুধাবন করার জন্য যথোপযোগী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করলাম।[১৯] আল্লাহ তাঁর কাজ সম্পন্ন করেই থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। আর যখন সে তার পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, আমি তাকে ফায়সালা করার শক্তি ও জ্ঞান দান করলাম।[২০] এভাবে আমি নেক লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।

১৬. বাইবেলে এ ব্যক্তির নাম লেখা হয়েছে "পোটীফর"। সামনের দিকে গিয়ে কুরআন মজীদ একে "আযীয" নামে উল্লেখ করেছে। তারপর আবার এক জায়গায় হযরত ইউসুফের জন্যও এ উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন মিসরের কোন বড় অফিসার অথবা পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। কারণ "আযীয" মানে হচ্ছে এমন কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি যার ক্ষমতাকে প্রতিহত করা যেতে পারে না। বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা হচ্ছে, তিনি ছিলেন বাদশাহর রক্ষক সেনাপতি (দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধান)। ইবনে জারীর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ছিলেন রাজকীয় অর্থ বিভাগের প্রধান।

১৭. তালমূদে এ মহিলাটিকে যালীখা (Zelicha) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এখান থেকেই এ নামটি মুসলমানদের বর্ণনায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের এখানে সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে যে, পরবর্তীকালে হযরত ইউসুফের সাথে মহিলাটির বিয়ে হয়ে যায়। একথাটির আসলে কুরআনে বা ইসরাঈলী ইতিহাসে কোন ভিত্তি নেই। একজন নবী এমন একটি মহিলাকে বিয়ে করবেন যার অসতিপনা তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায়ই ধরা পড়েছে—এটা আসলে তাঁর নবী সুলভ মর্যাদার তুলনায় অনেক

নিম্নমানের। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে যে সাধারণ নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে ঃ

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ –

"অসৎ মেয়েরা অসৎ পুরুষদের জন্য এবং অসৎ পুরুষরা অসৎ মেয়েদের জন্য আর পবিত্র মেয়েরা পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষরা পবিত্র মেয়েদের জন্য।"

১৮. তালমূদের বর্ণনামতে এ সময় হযরত ইউসুফের বয়স ছিল ১৮ বছর। পোটীফর তাঁর গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, এ যুবক গোলাম নয় বরং কোন অভিজাত পরিবারের আদরের দুলাল এবং অবস্থার আবর্তন তাকে এখানে টেনে এনেছে। তাকে কেনার সময়ই তিনি সওদাগরদের বলেন ঃ এ ছেলে তো কোন গোলাম বলে মনে হচ্ছে না, আমার সন্দেহ হচ্ছে তোমরা একে কোথাও থেকে চুরি করে এনেছো এ কারণে পোটীফর তাঁর সাথে দাস সুলভ ব্যবহার করেননি। বরং তাঁর ওপর নিজের গৃহের এবং নিজের যাবতীয় সম্পদ–সম্পত্তি পরিচালনার একচ্ছত্র দায়িত্ব অর্পণ করেন। বাইবেলের বর্ণনা মতে "তিনি নিজের সবকিছু ইউসুফের হাতে ছেড়ে দেন এবং শুধুমাত্র খাবার রুটি টুকু ছাড়া নিজের আর কোন জিনিসেরই তাঁর খবর ছিল না।" (আদি পুস্তক ৩৯ঃ৬)

১৯. এ পর্যন্ত হযরত ইউসুফের জীবন গড়ে উঠেছিল বিজন মরু প্রান্তরে আধা যাযাবর ও পশুপালকদের পরিবেশে। কেনান ও উত্তর আরব এলাকায় সে সময় কোন সংগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল না এবং সেখানকার সমাজ–সংস্কৃতিও তেমন কোন বড় ধরনের উন্নতি লাভ করেনি। সেখানে ছিল কিছুসংখ্যক স্বাধীন উপজাতির বাস। তারা মাঝে মাঝে এক এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় গিয়ে বসবাস করতো। আবার কোন কোন উপজাতি বিভিন্ন এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে নিজেদের ছোট ছোট রাষ্ট্রও গঠন করে নিয়েছিল। মিসরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী এসব লোকের অবস্থা ছিল প্রায় উপমহাদেশের উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বসবাসরত স্বাধীন পাঠান উপজাতিদের মতো। এখানে হযরত ইউসুফ যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন তাতে অবশ্যই অন্তরভুক্ত ছিল বেদুইন জীবনের সৎগুণাবলী এবং ইবরাহিমী পরিবারের আল্লাহমুখী জীবন চিন্তা ও ধর্মচর্চা। কিন্তু মহান আল্লাহ সমসাময়িক বিশ্বের সবচেয়ে সুসভ্য ও উন্নত দেশ অর্থাৎ মিসরে তাঁর মাধ্যমে যে কাজ নিতে চাচ্ছিলেন এবং এ জন্য যে পর্যায়ের জানাশোনা, অভিজ্ঞতা ও গভীর অন্তরদৃষ্টির প্রয়োজন ছিল তার বিকাশ সাধনের কোন সুযোগ বেদুইন জীবনে ছিল না। তাই আল্লাহ তাঁর সর্বময় ক্ষমতাবলে তাঁকে মিসর রাজের একজন বড় সরকারী কর্মচারীর কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। আর তিনি তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা দেখে তাঁকে নিজের গৃহ ও ভূসম্পত্তির দেখাশোনা ও পরিচালনার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দান করলেন। এভাবে ইতিপূর্বে তাঁর যেসব যোগ্যতাকে কোন কাজে লাগানো হয়নি তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করার সুযোগ পেয়ে গেলো। ছোট্ট একটি জমিদারী পরিচালনার মাধ্যমে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তা আগামীতে একটি বড় রাষ্ট্রের আইন শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ছিল। এ আয়াতে এ বিষয়টির দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

যে মহিলাটির ঘরে সে ছিল সে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে থাকলো এবং একদিন সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললো, "চলে এসো"। ইউসুফ বললো, "আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি, আমার রব তো আমাকে ভালই মর্যাদা দিয়েছেন (আর আমি এ কাজ করবো!)। এ ধরনের জালেমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।"[২১] মহিলাটি তার দিকে এগিয়ে এলো এবং ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি না তার রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতো।[২২] এমনটিই হলো, যাতে আমি তার থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করে দিতে পারি।[২৩] আসলে সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের অন্তরভুক্ত।

২০. কুরআনের ভাষায় সাধারণভাবে এমন শব্দের মানে হয় "নবুওয়াত দান করা।" ফায়সালা করার শক্তিকে কুরআনের মূল ভাষ্যে বলা হয়েছে "হুকুম"। এ হুকুম অর্থ কর্তৃত্বও হয়। কাজেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বান্দাকে হুকুম দান করার মানে হলো আল্লাহ তাঁকে মানব জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে ফায়সালা দান করার যোগ্যতা দান করেছেন আবার এ জন্য ক্ষমতাও অর্পণ করেছেন। আর "জ্ঞান" বলতে এমন বিশেষ সত্যজ্ঞান বুঝানো হয়েছে যা নবীদেরকে অহীর মাধ্যমে সরাসরি দেয়া হয়।

২১. সাধারণভাবে মুফাসসির ও অনুবাদকগণ মনে করে থাকেন, এখানে "আমার রব" তথা আমার প্রভু শব্দটি বলে হযরত ইউসুফ সেসময় যার অধীনে চাকরি করতেন তার কথা বলতে চেয়েছেন। তারা মনে করেন, তাঁর এ জবাবের অর্থ ছিল এই যে, আমার মনিব তো আমাকে খুব যত্নের সাথেই রেখেছেন, এ অবস্থায় আমি তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করার মতো নিমকহারামী কেমন করে করতে পারি? কিন্তু এ অনুবাদ ও ব্যাখ্যার আমি কঠোর বিরোধিতা করছি। যদিও আরবী ভাষার দিক দিয়ে এ অর্থ গ্রহণ করারও অবকাশ আছে, কারণ আরবীতে "রব" শব্দটি প্রভু অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু একজন নবী একটি গুনাহ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহর পরিবর্তে কোন বান্দার প্রতি নজর দেবেন এটা তাঁর মর্যাদার তুলনায় অনেক নিম্নমানের। তাছাড়া কোন নবী আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজের রব বলেছেন, কুরআনে এর কোন নজীরও নেই। সামনের দিকে ৪১, ৪২ ও ৫০ আয়াতে আমরা দেখছি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বারবার তাঁর নিজের ও মিসরীয়দের মতবাদের মধ্যে এ পার্থক্যটি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরছেন যে, তাঁর রব হচ্ছেন

আল্লাহ এবং মিসরীয়রা বান্দাকে নিজেদের রব বানিয়ে রেখেছে। কাজেই এখানে আয়াতের শব্দের মধ্যে যখন এ অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ "রব্বী" বলে আল্লাহর সত্তা বুঝাতে চেয়েছেন তখন কি কারণে আমরা এমন একটি অর্থ গ্রহণ করবো যার মধ্যে দোষের দিকটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে?

২২. মূল আয়াতে আছে "বুরহান।" বুরহান মানে দলীল বা প্রমাণ। রবের প্রমাণ মানে রবের দেখিয়ে দেয়া বা বুঝিয়ে দেয়া এমন প্রমাণ যার ভিত্তিতে হযরত ইউসুফের (আ) বিবেক তার ব্যক্তিসত্তার কাছ থেকে একথার স্বীকৃতি আদায় করেছে যে, এ নারীর ভোগের আহবানে সাড়া দেয়া তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এ প্রমাণটি কি ছিল? ইতিপূর্বে পিছনের বাক্যেই তা বলে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আমার রব তো আমাকে ভালই মর্যাদা দিয়েছেন আর আমি এমন খারাপ কাজ করবো। এ ধরনের জালেমরা কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।" এ অকাট্য যুক্তিই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সদ্যোন্মিত যৌবনকালের এ সংকট সন্ধিক্ষণে পাপ কাজ থেকে বিরত রেখেছিল। তারপর বলা হলো, "ইউসুফও তার দিকে এগিয়ে যেতো যদি না তার রবের জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষ করতো।" এ থেকে নবীগণের নিষ্পাপ হবার (ইস্‌মতে আম্বিয়া) তত্ত্বের অন্তরনিহিত সত্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবীর নিষ্পাপ হবার মানে এ নয় যে, তাঁর গুনাহ, ভুল ও ত্রুটি করার ক্ষমতা ও সামর্থ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, ফলে তাঁর দ্বারা গুনাহর কাজ সংঘটিত হতেই পারে না। বরং এর মানে হচ্ছে, নবী যদিও গুনাহ করার শক্তি রাখেন কিন্তু সমস্ত মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া এবং যাবতীয় মানবিক আবেগ, অনুভূতি, ইচ্ছা-প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও তিনি এমন সদাচারী ও আল্লাহভীরু হয়ে থাকেন যে, জেনেবুঝে কখনো গুনাহ করার ইচ্ছা করেন না। তাঁর বিবেকের অভ্যন্তরে আল্লাহর এমন সব শক্তিশালী দলীল প্রমাণ তিনি রাখেন যেগুলোর মোকাবিলায় প্রবৃত্তির কামনা বাসনা কখনো সফলকাম হবার সুযোগ পায় না। আর যদি সজ্ঞানে তিনি কোন ত্রুটি করেই বসেন তাহলে মহান আল্লাহ তখনই সুস্পষ্ট অহীর মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেন। কারণ তাঁর পদস্খলন শুধুমাত্র এক ব্যক্তির পদস্খলন নয় বরং সমগ্র উম্মতের পদস্খলনের রূপ নেয়। তিনি সঠিক পথ থেকে এক চুল পরিমাণ সরে গেলে সারা দুনিয়া গোমরাহীর পথে মাইলের পর মাইল চলে যায়।

২৩. এ উক্তির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তার রবের প্রমাণ দেখা ও গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া আমার দেয়া সুযোগ ও পথপ্রদর্শনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। কেননা, আমি নিজের এ নির্বাচিত বান্দাটি থেকে অসৎবৃত্তি ও অশ্লীলতা দূর করতে চাচ্ছিলাম। এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে এবং এটি অত্যন্ত গভীর অর্থবোধক যে, ইউসুফের সাথে এই যে ব্যাপারটি ঘটে গেলো এটি আসলে তার প্রশিক্ষণ পর্বের একটি প্রয়োজনীয় পর্যায় ছিল। তাঁকে অসৎ প্রবণতা ও অশ্লীলতা মুক্ত করার এবং তাঁর আত্মিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌছিয়ে দেবার জন্য আল্লাহর নিয়ম অনুযায়ী অপরিহার্য ছিল যে, তাঁর সামনে গুনাহের এমনি একটি সংকটময় পরিস্থিতি আসুক এবং সেই পরীক্ষার সময় তিনি নিজের সমগ্র ইচ্ছাশক্তিকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পাল্লায় রেখে দিয়ে নিজের নফ্‌সের অসৎ প্রবণতাগুলোকে চিরকালের জন্য চূড়ান্তভাবে পরাজিত করুন। বিশেষ করে তদানীন্তন মিসরীয় সমাজে যে নৈতিক পরিবেশ বিরাজিত ছিল তা দৃষ্টি সমক্ষে রাখলে এ

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٧﴾

শেষ পর্যন্ত ইউসুফ ও সে আগেপিছে দরজার দিকে দৌড়ে গেলো এবং সে পেছন থেকে ইউসুফের জামা (টেনে ধরে) ছিঁড়ে ফেললো। উভয়েই দরজার ওপর তার স্বামীকে উপস্থিত পেলো। তাকে দেখতেই মহিলাটি বলতে লাগলো, "তোমার পরিবারের প্রতি যে অসৎ কামনা পোষণ করে তার কি শাস্তি হতে পারে? তাকে কারাগারে প্রেরণ করা অথবা কঠোর শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কি শাস্তি দেয়া যেতে পারে?" ইউসুফ বললো, "সে-ই আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছিল।" "মহিলাটির নিজের পরিবারের একজন (পদ্ধতিগত) সাক্ষ দিল,[২৪] *"যদি ইউসুফের জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যুক আর যদি তার জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।"*[২৫]

বিশেষ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে। সামনের দিকে চতুর্থ রুকূতে এ পরিবেশের একটি সামান্যতম নমুনা দেখানো হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যাবে, তৎকালীন 'সুসভ্য মিসরে' সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে সে দেশের উচ্চ শ্রেণীতে স্বাধীন যৌনাচারিতা প্রায় বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশসমূহে এবং আমাদের দেশের ফিরিংগী প্রভাবিত সমাজের সমমানে অবস্থান করছিল। এ ধরনের বিকৃত রুচিসম্পন্ন লোকদের মধ্যে হযরত ইউসুফকে কাজ করতে হবে। এ কাজ করতে হবে একজন সাধারণ লোক হিসেবে নয় বরং দেশের শাসনকর্তা হিসেবে। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, একজন সুন্দর ও সুশ্রী গোলামের জন্য যেসব ভদ্র মহিলা নিজেদেরকে এভাবে বিলীন করে দিচ্ছিল তারা একজন যুবক বয়সের সুদর্শন শাসনকর্তাকে পথভ্রষ্ট করার ও ফাঁদে ফেলার জন্য কত কী–ইনা করতে পারতো। আল্লাহ এরি পথ বন্ধ করার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, প্রথমেই এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করিয়ে হযরত ইউসুফকে পাকাপোক্ত করে দিয়েছেন তারপর অন্যদিকে মিসরীয় মহিলাদেরকেও তাঁর ব্যাপারে হতাশ করে দিয়ে তাদের সমস্ত ছলনা ও কারসাজির দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ ﴿۲۸﴾ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٚ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚۖ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ ﴿۲۹﴾

স্বামী যখন দেখলো ইউসুফের জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া তখন সে বললো, "এসব তোমাদের মেয়েলোকদের ছলনা। সত্যিই বড়ই ভয়ানক তোমাদের ছলনা! হে ইউসুফ! এ ব্যাপারটি উপেক্ষা করো। আর হে নারী! তুমি নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো, তুমিই আসল অপরাধী।"[২৫] (ক)

২৪. এ ব্যাপারটি মনে হয় এভাবে ঘটে থাকবে যে, গৃহকর্তার সাথে সংশ্লিষ্ট মহিলার আত্মীয়দের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিও আসছিল। সে এ ঝগড়া শুনে হয়তো বলেছে ঃ এরা দু'জনেই যখন পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করছে এবং উপস্থিত ঘটনার কোন সাক্ষীও নেই তখন পরিবেশগত সাক্ষের সূত্র ধরে বিষয়টি সম্পর্কে এভাবে অনুসন্ধান চালানো যেতে পারে। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু এ সাক্ষ পেশ করেছিল। শিশুটি ঐ ঘরে দোলনায় শায়িত ছিল। আল্লাহ তাকে বাকশক্তি দান করে তার মুখ দিয়ে এ সাক্ষের কথা উচ্চারণ করিয়েছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি কোন নির্ভুল সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। আর তাছাড়া এ ব্যাপারে অযথা মু'জিযার সাহায্য নেয়ার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সাক্ষদাতা যে পরিবেশগত সাক্ষের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা ছিল যথার্থই যুক্তিসংগত ব্যাপার। এ সাক্ষের প্রতি দৃষ্টি দিলে এক মুহূর্তেই বুঝা যায় যে, এ ব্যক্তি অতীব বিচক্ষণ, সূক্ষ্মদর্শী ও ব্যাপকতর অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিল। ঘটনার চিত্র তার সামনে এসে যেতেই সে তার গভীরে পৌঁছে গেছে। বিচিত্র নয় যে, উল্লেখিত ব্যক্তি কোন বিচারপতি বা ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে। (উল্লেখ থাকে, মুফাস্সিরগণ দুগ্ধপোষ্য শিশুর সাক্ষদানের যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তা ইহুদী বর্ণনা থেকে গৃহীত হয়েছে। দেখুন, তালমূদের নির্বাচিত অংশ, পল ইসহাক হিরশূন, লণ্ডন ১৮৮০, ২৫৬ পৃষ্ঠা)

২৫. এর মানে হচ্ছে, ইউসুফের কাপড় যদি সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে ইউসুফের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং মহিলাটি নিজেকে বাঁচাবার জন্য ধস্তাধস্তিতে লিপ্ত হয়েছিল, এটা হবে তার স্পষ্ট আলামত। কিন্তু যদি ইউসুফের কাপড় পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে স্পষ্ট বুঝতে হবে, মহিলাটি তার পেছনে লেগেছিল এবং ইউসুফ তার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। এ ছাড়াও আর একটি বাস্তব সাক্ষও এ সাক্ষের মধ্যে লুকিয়েছিল। সেটি হচ্ছে, এ সাক্ষী শুধুমাত্র ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাপড়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছে। এ থেকে একথা

পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মহিলাটির শরীরে বা পোশাকে আদতে বল প্রয়োগের কোন আলামতই ছিল না। অথচ যদি এটা বলাৎকারজনিত মামলা হতো তাহলে মহিলাটির শরীরে ও পোশাকে এর পরিষ্কার আলামত দেখা যেতো।

২৫(ক). বাইবেলে এ কাহিনীকে যে কদাকাররূপে চিত্রিত করা হয়েছে নিচের বর্ণনায় তা দেখা যেতে পারে ঃ

"তখন সে যোসেফের বস্ত্র ধরিয়া বলিল, আমার সহিত শয়ন কর ; কিন্তু যোসেফ তাহার হস্তে আপন বস্ত্র ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে পলাইয়া গেলেন। তখন যোসেফ তাহার হস্তে বস্ত্র ফেলিয়া রাখিয়া বাহিরে পলাইলেন দেখিয়া, সে নিজ ঘরের লোকদিগকে ডাকিয়া কহিল, দেখ তিনি আমাদের সাথে ঠাট্টা করিতে একজন ইব্রীয় পুরুষকে আনিয়াছেন, সে আমার সংগে শয়ন করিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছিল, তাহাতে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, আমার চীৎকার শুনিয়া সে আমার নিকটে নিজ বস্ত্রখানি ফেলিয়া বাহিরে পলাইয়া গেল। আর যে পর্যন্ত তাহার কর্তা ঘরে না আসিলেন, সে পর্যন্ত সেই স্ত্রীলোক তাঁহার বস্ত্র আপনার কাছে রাখিয়া দিল।....... তাঁহার প্রভু যখন আপন স্ত্রীর একথা শুনিলেন যে, " তোমার দাস আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছে", তখন ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অতএব যোসেফের প্রভু তাঁহাকে লইয়া কারাগারে রাখিলেন, যে স্থানে রাজার বন্দিগণ বদ্ধ থাকিত।" (আদি পুস্তক ৩৯ঃ১২-২০)

এ অদ্ভুত বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে, হযরত ইউসুফ এমন ধরনের পোশাক পরেছিলেন যে, যুলাইখা তাতে হাত লাগাতেই সমস্ত পোশাকটাই খুলে তার হাতে এসে পড়লো! তারপর আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, হযরত ইউসুফ নিজে পোশাক তার কাছে রেখে দিয়ে একেবারে দিগম্বর হয়ে ভাগলেন এবং তাঁর পোশাক (অর্থাৎ তাঁর অপরাধের অনস্বীকার্য প্রমাণ) ঐ মহিলার কাছে রয়ে গেলো। এরপরে হযরত ইউসুফের অপরাধী হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে কি?

এতো গেলো বাইবেলের বর্ণনা। অন্যদিকে তালমূদের বর্ণনা হচ্ছে, পোটিফর যখন তার স্ত্রীর মুখ থেকে এ অভিযোগ শুনলেন তখন তিনি ইউসুফকে খুব মারধর করালেন। তারপর তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করলেন। আদালতে কর্মকর্তারা হযরত ইউসুফের পোশাক পরীক্ষা করে রায় দিল, "দোষ মহিলাটির, কারণ কাপড় সামনের দিক থেকে নয় বরং পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া।" কিন্তু যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সামান্য চিন্তা করলেই একথাটি বুঝতে পারে যে, কুরআনের বর্ণনা তালমূদের বর্ণনা থেকে অনেক বেশী যুক্তিসংগত। একথা কেমন করে মেনে নেয়া যায় যে, এত বড় একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর ওপর নিজের দাসের তথাকথিত চড়াও হবার মামলাটি নিজেই আদালতে নিয়ে গেছেন? এটি কুরআন ও ইসরাঈলী বর্ণনার মধ্যে পার্থক্যের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত। এ থেকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কাহিনীটি বনী ইসরাঈলদের থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন বলে পশ্চিমী প্রাচ্যবিদরা যে অভিযোগ আনেন তার অন্তসারশূন্যতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সত্যি কথা হচ্ছে, কুরআন তাদের বর্ণনা সংশোধন করেছে এবং সঠিক সত্য ঘটনাটিই দুনিয়াবাসীর সামনে তুলে ধরেছে।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۭ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗٓ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۭ اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ۝ قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ۭ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ۭ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ ۝

৪ রুকূ'

শহরের মেয়েরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো।, "আযীযের স্ত্রী তার যুবক গোলামের পেছনে পড়ে আছে, প্রেম তাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। আমাদের মতে সে পরিষ্কার ভুল করে যাচ্ছে।" সে যখন তাদের এ শঠতাপূর্ণ কথা শুনলো তখন তাদেরকে ডেকে পাঠালো। তাদের জন্য হেলান দিয়ে বসার মজলিসের আয়োজন করলো।[২৬] খাওয়ার বৈঠকে তাদের সবার সামনে একটি করে ছুরি রাখলো। (তারপর ঠিক সেই মুহূর্তে যখন তারা ফল কেটে কেটে খাচ্ছিল) সে ইউসুফকে তাদের সামনে বের হয়ে আসার ইশারা করলো। যখন ঐ মেয়েদের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো, তারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো। এবং নিজেদের হাত কেটে ফেললো। তারা বললো, "আল্লাহর কী অপার মহিমা! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্‌তা।" আযীযের স্ত্রী বললো, " দেখলে তো! এ হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করতে। অবশ্যই আমি তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। যদি সে আমার কথা না মেনে নেয় তাহলে কারারুদ্ধ হবে এবং নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।"[২৭]

২৬. অর্থাৎ এমন মজলিস যে মজলিসে মেহমানদের হেলান দিয়ে বসার জন্য বালিশ সাজানো ছিল। মিসরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার থেকেও এর সত্যতার

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

ইউসুফ বললো, "হে আমার রব! এরা আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাচ্ছে তার চাইতে কারাগারই আমার কাছে প্রিয়! আর যদি তুমি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে না বাঁচাও তাহলে আমি এদের ফাঁদে আটকে যাবো এবং অজ্ঞদের অন্তরভুক্ত হবো।[২৮] *—তার রব তার দোয়া কবুল করলেন এবং তাদের অপকৌশল থেকে তাকে রক্ষা করলেন।*[২৯] *অবশ্যি তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন।*

প্রমাণ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে তাদের মজলিসে মহফিলে বালিশের ব্যাপক ব্যবহার ছিল।

বাইবেলে এ ভোজসভার কোন উল্লেখ নেই। তবে তালমূদে এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার বর্ণনাধারা কুরআন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কুরআনের বর্ণনায় যে জীবন জোয়ার, যে প্রাণশক্তি, স্বাভাবিকতা ও উন্নত নৈতিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় তালমূদে তার সামান্যতম স্পর্শও নেই।

২৭. এ থেকে তদানীন্তন মিসরের উচ্চ ও অভিজাত সমাজে নৈতিকতার অবস্থা কোথায় গিয়ে ঠেকেছিল তা অনুমান করা যায়। একথা সুস্পষ্ট, আযীযের স্ত্রী যেসব মহিলাকে দাওয়াত দিয়েছিল তারা নিশ্চয়ই নগরের আমীর–উমরাহ ও বড় বড় সরকারী কর্মকর্তাদের বেগমরাই ছিল। এসব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ভদ্র মহিলার সামনে সে নিজের প্রিয় যুবককে পেশ করলো। তার সুদর্শন যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ সুষমা দেখিয়ে সে তাদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলো যে, এমন সুন্দর যুবকের জন্য যদি আমি পাগল না হয়ে যাই তাহলে আর কী হবো৷ তারপর এসব পদস্থ ব্যক্তিবর্গের স্ত্রী–কন্যারা নিজেদের কাজের মাধ্যমে যেন একথার সত্যতা প্রমাণ করলো যে, সত্যিই এ ধরনের অবস্থায় তাদের প্রত্যেকেই ঠিক তাই করতো যা আযীযের স্ত্রী করেছে। আবার অভিজাত মহিলাদের এ ভরা মজলিসে মেজবান সাহেবা প্রকাশ্যে এ সংকল্প ঘোষণা করতে একটুও লজ্জা অনুভব করলো না যে, যদি এ সুন্দর যুবক তার কামনার ক্রীড়নক হতে রাযি না হয় তাহলে সে তাকে কারাগারে পাঠিয়ে দেবে। এ সবকিছুই একথা প্রমাণ করে যে, ইউরোপ ও আমেরিকা এবং তাদের প্রাচ্যদেশীয় অন্ধ অনুসারীরা আজ যে নারী স্বাধীনতা এবং নারীদের অবাধ বিচরণ ও মেলামেশাকে বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীলতার অবদান মনে করে থাকে তা আসলে কোন নতুন জিনিস নয়, অনেক পুরাতন, প্রাচীন জিনিস। অতি প্রাচীনকালে দাকিয়ানুসের শাসনেরও বহুশত বছর আগে মিসরে ঠিক একই রকম শানশওকতের সাথে এর প্রচলন ছিল যেমন আজকের এ "প্রগতিশীলতার" যুগে আছে।

২৮. সে সময় হযরত ইউসুফ যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ আয়াতগুলো আমাদের সামনে তার একটি অদ্ভুত চিত্র তুলে ধরেছে। উনিশ বিশ বছরের একটি সুন্দর যুবক। বেদুইন জীবনের উদ্দামতায় লালিত বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহী। আত্মীয়–স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবাস জীবন, দেশান্তর ও বলপূর্বক দাসত্বের পর্যায় অতিক্রম করার পর ভাগ্য তাকে দুনিয়ার বৃহত্তম সুসভ্য রাষ্ট্রের রাজধানীতে একজন উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির বাড়িতে টেনে এনেছে। এখানে এ বাড়ির যে বেগম সাহেবার সাথে সকাল বিকাল তাকে ওঠাবসা করতে হয় সে–ই প্রথমে তার পেছনে লাগে। তারপর তার সৌন্দর্যের আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাষ্ট্রে। সারা শহরের অভিজাত পরিবারের মেয়েরা তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে। এখন তার চতুর্দিকে সর্বত্র সবসময় শত শত সুন্দর জাল বিছানো থাকে তাকে আটকাবার জন্য। তার ভাবাবেগকে উসকিয়ে দেবার এবং তার ধার্মিকতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার জন্য সব ধরনের কৌশল ও ফন্দি আঁটা হতে থাকে। তিনি যেদিকে যান সেদিকেই দেখতে পান পাপ তার সমস্ত চাকচিক্য ও মোহনীয়তা নিয়ে দরজা উন্মুক্ত করে তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকে অসৎ ও অশালীন কার্যকলাপ করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু এখানে সুযোগই তাকে খুঁজে ফিরছে এবং সবসময় ওঁৎ পেতে আছে যখনই তার মনে অসৎকাজের প্রতি সামান্যতম ঝোঁকপ্রবণতা দেখা দেবে তখনই সে তার সামনে নিজেকে পেশ করে দেবে। দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা তিনি এক মহা আতংকের মধ্যে জীবন যাপন করছেন। কখনো মাত্র এক লহমার জন্য যদি তাঁর ইচ্ছা ও সংকল্পের বাঁধন সামান্যতম ঢিলে হয়ে যায় তাহলে পাপের যে অসংখ্য দরজা তার অপেক্ষায় হরহামেশা খোলা আছে তার যে কোন একটির মধ্য দিয়ে তিনি ভেতরে পবেশ করে যেতে পারেন। এ অবস্থায় এ আল্লাহ বিশ্বাসী যুবক যে সাফল্যের সাথে এসব শয়তানী প্ররোচনার মোকাবিলা করেছেন তা এমনিতেই কম প্রশংসনীয় নয়। কিন্তু এ সর্বোচ্চ মানের আত্মসংযমের পরিচয় দেয়ার পর আত্মোপলব্ধি ও চিন্তার বিশুদ্ধতারও তিনি চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এমন নজীরবিহীন পরহেজগারীর দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরও তাঁর মনে কখনো এ মর্মে অহমিকা জাগেনি যে, "বাহ, কত মজবুত আমার চরিত্র! এতো সুন্দরী ও যুবতী মেয়েরা আমার প্রেমে পাগলপারা কিন্তু এরপরও আমার পদস্খলন হয়নি।" বরং এর পরিবর্তে তিনি নিজের মানবিক দুর্বলতার কথা চিন্তা করে ভয়ে কেঁপে উঠেছেন এবং অত্যন্ত দীনতার সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে বলেছেন, হে আমার রব! আমি একজন দুর্বল মানুষ। এ অসংখ্য অগণিত প্ররোচণার মোকাবিলা করার শক্তি আমার কোথায়! তুমি আমাকে সহায়তা দান করো এবং আমাকে বাঁচাও। আমি ভয় করছি আমার পা পিছলে না যায়—আসলে এটি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের নৈতিক প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটময় অধ্যায় ছিল। বিশ্বস্ততা, আমানতদারী, চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, সত্যনিষ্ঠা, অকপটতা, সংযম ও চিন্তার ভারসাম্যের অসাধারণ গুণাবলী এ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল এবং এ সম্পর্কে তিনি নিজেও বেখবর ছিলেন। এ কঠোর পরীক্ষার যুগে এ গুণগুলো সবই তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠলো। এগুলো পূর্ণ শক্তিতে কাজ করতে থাকলো। তিনি নিজেও জানতে পারলেন তাঁর মধ্যে কোন্ কোন্ শক্তি আছে এবং তাদেরকে তিনি কোন্ কোন্ কাজে লাগাতে পারেন।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ۝

তারপর তারা মনে করলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে কারারুদ্ধ করতে হবে, অথচ তারা (তার নিষ্কলুষতা এবং নিজেদের স্ত্রীদের অসতিপনার) সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে নিয়েছিল।[৩০]

২৯. রক্ষা করা এ অর্থে যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৎচরিত্রকে এমন শক্তিমত্তা ও দৃঢ়তা দান করা হয় যার ফলে তার মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট নারী সমাজের সমস্ত অপকৌশলই ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাছাড়া এ অর্থেও রক্ষা করা যে, আল্লাহর ইচ্ছায় কারাগারের দরজা তাঁর জন্য খুলে দেয়া হয়।

৩০. এভাবে হযরত ইউসুফকে কারাগারে নিক্ষেপ করা আসলে তাঁর নৈতিক বিজয় এবং মিসরের সমগ্র অভিজাত ও শাসক সমাজের চূড়ান্ত নৈতিক পরাজয়ের ঘোষণা ছিল। হযরত ইউসুফ তখন কোন অজ্ঞাতনামা ও অপরিচিত লোক ছিলেন না। সারাদেশে এবং কমপক্ষে তো রাজধানী নগরীতে বিশেষ ও সাধারণ সব মহলেই তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। যে ব্যক্তির আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি দু'–একটি নয়, অধিকাংশ অভিজাত পরিবারের মহিলারা প্রণয়াসক্ত এবং যার মনমাতানো ও চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যের তীব্র আকর্ষণে নিজেদের দাম্পত্য জীবন ধ্বংস হতে দেখে মিসরের শাসকরা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেই নিজেদের ঘর–দোর সামলাবার ব্যবস্থা করেছিল। এহেন ব্যক্তিত্ব কখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে পারে না, একথা সহজেই অনুমান করা যায়। নিশ্চয়ই প্রতি ঘরে তাঁর কথা আলোচিত হতো। সাধারণভাবেও লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁর অসাধারণ উন্নত, শক্তিশালী ও পবিত্র চরিত্রের কথা জেনে গিয়েছিল। তারা জেনেছিল, এ ব্যক্তিকে তার কোন অপরাধের কারণে কারাগারে পাঠানো হয়নি বরং মিসরের অভিজাত লোকেদের জন্য নিজেদের স্ত্রী–কন্যাদেরকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার পরিবর্তে এ নিরপরাধকে কারগারে পাঠানো সহজ ছিল বলেই তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এ থেকে একথাও জানা গেলো, কোন ব্যক্তিকে ইনসাফের শর্ত অনুযায়ী আদালতে অপরাধী প্রমাণ না করেই খেয়ালখুশীমত গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া বেঈমান শাসকদের পুরাতন রীতি। এ ব্যাপারেও আজকের শয়তানরা চার হাজার বছর আগের শয়তানদের থেকে খুব বেশী ভিন্নতর নয়। ফারাক কেবল এতটুকুই, তারা "গণতন্ত্রের" নাম নিত না আর এরা নিজেদের কার্যকলাপের সাথে গণতন্ত্রের নাম নেয়। তারা কোন আইন ছাড়াই বেআইনী কার্যকলাপ করতো। আর এরা প্রত্যেকটি অবৈধ অন্যায় কাজের জন্য প্রথমে একটি "আইন" তৈরী করে নেয়। তারা পরিষ্কারভাবে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানুষের ওপর জুলুম অত্যাচার করতো আর এরা যার ওপর জুলুম নির্যাতন চালায় তার সম্পর্কে দুনিয়াবাসীকে বুঝাবার চেষ্টা করে যে, তার কারণে তার নিজের নয় বরং দেশ ও জাতির জন্য আশংকা দেখা দিয়েছিল। মোটকথা, তারা শুধু জালেম ছিল কিন্তু এরা সেই সাথে মিথ্যুক এবং নির্লজ্জও।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ
وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ
نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۶﴾ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ
تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ
رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
كٰفِرُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ
مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا
وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۳۸﴾

৫ রুকূ'

কারাগারে[৩১] তার সাথে আরো দু'টি ভৃত্যও প্রবেশ করলো।[৩২] একদিন তাদের একজন তাকে বললো, "আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি মদ তৈরী করছি।" অন্যজন বললো, "আমি দেখলাম আমার মাথায় রুটি রাখা আছে এবং পাখিরা তা খাচ্ছে।" তারা উভয়ে বললো, "আমাদের এর তা'বীর বলে দিন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল হিসেবে পেয়েছি।"[৩৩] ইউসুফ বললো ঃ

"এখানে তোমরা যে খাবার পাও তা আসার আগেই আমি তোমাদের এ স্বপ্নগুলোর অর্থ বলে দেবো। আমার রব আমাকে যা দান করেছেন এ জ্ঞান তারই অন্তরভুক্ত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং আখেরাত অস্বীকার করে তাদের পথ পরিহার করে আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের পথ অবলম্বন করেছি। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। আসলে এটা আমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ (যে, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারোর বান্দা হিসেবে তৈরী করেননি) কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৩১. হযরত ইউসুফকে যখন কারাগারে পাঠানো হয়েছিল তখন সম্ভবত তাঁর বয়স বিশ একুশ বছরের বেশী ছিল না। তালমূদে বলা হয়েছে, কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝٣٩ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝٤٠

হে জেলখানার সাথীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ, যিনি সবার ওপর বিজয়ী।"

তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের বন্দেগী করছো তারা শুধুমাত্র কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষরা রেখেছো, আল্লাহ এগুলোর পক্ষে কোন প্রমাণ পাঠাননি। শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। তাঁর হুকুম—তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর বন্দেগী করবে না। এটিই সরল সঠিক জীবন পদ্ধতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

তিনি মিসরের শাসনকর্তা হন তখন তাঁর বয়স ছিল তিরিশ বছর। এদিকে কুরআন বলছে, কারাগারে তিনি بضع سنين অর্থাৎ কয়েক বছর কাটান। بضع শব্দটি আরবী ভাষায় ১০ পর্যন্ত সংখ্যার জন্য বলা হয়ে থাকে।

৩২. হযরত ইউসুফের সাথে এই যে দু'জন গোলাম কারাগারে প্রবেশ করেছিল তাদের সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা হচ্ছে, তাদের একজন ছিল মিসরের বাদশাহর মদ পরিবেশকদের সরদার এবং দ্বিতীয়জন রাজকীয় রুটি প্রস্তুতকারকদের অফিসার। তালমূদের বর্ণনা মতে, মিসরের বাদশাহ তাদের এ অপরাধে কারাগারে পাঠিয়েছিলেন যে, একবার এক দাওয়াতের মজলিসে পরিবেশিত রুটি একটু বিস্বাদ লেগেছিল এবং একটি মদের পাত্রে পাওয়া গিয়েছিল মাছি।

৩৩. কারাগারে হযরত ইউসুফকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখা হতো এ থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। ওপরে যেসব ঘটনার কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো সামনে রাখলে ব্যাপারটা আর মোটেই বিস্ময়কর মনে হয় না যে, এ কয়েদী দুজন হযরত ইউসুফের কাছেই-বা এসে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলো কেন এবং তাঁকে "আমরা আপনাকে সদাচারী হিসেবে পেয়েছি" বলে শ্রদ্ধার্ঘ পেশ করলো কেন। জেলখানার ভেতরে বাইরে সবাই জানতো, এ ব্যক্তি কোন অপরাধী নয়, বরং একজন অত্যন্ত সদাচারী পুরুষ। কঠিনতম পরীক্ষায় তিনি নিজের আল্লাহভীতি ও আল্লাহর হুকুম মেনে চলার প্রমাণ পেশ করেছেন। আজ সারাদেশে তাঁর চেয়ে বেশী সৎব্যক্তি আর কেউ নেই। এমনকি দেশের ধর্মীয় নেতাদের মধ্যেও তাঁর মতো লোক একজনও নেই। এ কারণে শুধু কয়েদীরাই

يَٰصَٰحِبَيِ ٱلسِّجۡنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسۡقِي رَبَّهُۥ خَمۡرٗاۖ وَأَمَّا ٱلۡأٓخَرُ فَيُصۡلَبُ فَتَأۡكُلُ ٱلطَّيۡرُ مِن رَّأۡسِهِۦۚ قُضِيَ ٱلۡأَمۡرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسۡتَفۡتِيَانِ ۝٤١ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٖ مِّنۡهُمَا ٱذۡكُرۡنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ ذِكۡرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجۡنِ بِضۡعَ سِنِينَ ۝٤٢

হে জেলখানার সাথীরা! তোমাদের স্বপ্নের তা'বীর হচ্ছে, তোমাদের একজন তার নিজের প্রভুকে (মিসর রাজ) মদ পান করাবে আর দ্বিতীয় জনকে শূলবিদ্ধ করা হবে এবং পাখি তার মাথা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। তোমরা যে কথা জিজ্ঞেস করছিলে তার ফায়সালা হয়ে গেছে।৩৪

আবার তাদের মধ্য থেকে যার সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে ইউসুফ তাকে বললো ঃ " তোমার প্রভুকে (মিসরের বাদশাহ) আমার কথা বলো।" কিন্তু শয়তান তাকে এমন গাফেল করে দিল যে, সে তার প্রভুকে (মিসরের বাদশাহ) তার কথা বলতে ভুলে গেলো। ফলে ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে পড়ে রইলো।৩৫

তাঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতো না বরং কয়েদখানার পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মচারীরাও তাঁর ভক্তদলে শামিল হয়ে গিয়েছিল। বাইবেলে বলা হয়েছে ঃ "কারারক্ষক কারাস্থিত সমস্ত বন্দির ভার যোসেফের হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তথাকার লোকদের সমস্ত কর্ম যোসেফের আজ্ঞা অনুসারে চলিতে লাগিল। কারারক্ষক তাঁহার হস্তগত কোন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেন না।" (আদি পুস্তক ৩৯ঃ ২২, ২৩)

৩৪. এখানে যে কাহিনীটি বর্ণনা করা হয়েছে এ ভাষণটি হচ্ছে তার প্রাণ। এটি কুরআনেরও তাওহীদ সম্পর্কিত সর্বোত্তম ভাষণগুলোর অন্যতম। কিন্তু বাইবেল ও তালমূদে কোথাও এ সম্পর্কে সামান্য ইংগিতও নেই। সেখানে হযরত ইউসুফকে নিছক একজন জ্ঞানী ও আল্লাহভীরু লোক হিসেবেই পেশ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন কেবল তাঁর চরিত্রের এ দিকগুলোকে বাইবেল ও তালমূদের চাইতে বেশী উজ্জ্বল করে পেশ করেছে তাই নয় বরং এ ছাড়াও আমাদেরও একথা জানায় যে, হযরত ইউসুফের নিজের একটি নবুওয়াত মিশন ছিল এবং তাঁর দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ তিনি কারাগারেই শুরু করে দিয়েছিলেন।

এ ভাষণটির ওপর শুধুমাত্র সাদামাটাভাবে চোখ বুলিয়ে চলে যাওয়া যাবে, এমন পর্যায়ের ভাষণ এটি নয়। এর এমন অনেকগুলো দিক আছে যেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন আছে ঃ

এক ঃ এ প্রথম আমরা দেখছি হযরত ইউসুফ (আ) আল্লাহর সত্য দীনের প্রচার করছেন। এর আগে তাঁর জীবন কাহিনীর যে অংশ কুরআন পেশ করেছে তাতে কেবলমাত্র

তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু তাবলীগ বা প্রচারের কোন আভাস সেখানে পাওয়া যায় না। এ থেকে প্রমাণ হয়, প্রথম পর্যায়গুলো ছিল নিছক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণমূলক। নবুওয়াতের কাজ কার্যত এ কারাগার পর্যায়ে তাঁকে সোপর্দ করা হয় এবং নবী হিসেবে এটি তাঁর প্রথম দাওয়াতী ভাষণ।

দুই ঃ এ প্রথম তিনি লোকদের সামনে নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করেন। এর আগে আমরা দেখেছি তিনি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন অত্যন্ত ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সাথে সেগুলো গ্রহণ করতে থেকেছেন। যখন কাফেলার লোকেরা তাঁকে ধরে গোলাম বানালো, যখন তিনি মিসরে আনীত হলেন, যখন তাঁকে মিসরের আযীযের হাতে বিক্রি করা হলো, যখন তাঁকে কারাগারে পাঠানো হলো, এর মধ্যে কোন এক সময়েও তিনি একথা বলেননি যে, তিনি ইবরাহীম ও ইসহাক আলাইহিমাস সালামের পৌত্র এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ছেলে। তাঁর বাপ ও দাদা কেউ অপরিচিত ছিলেন না। কাফেলার লোকেরা, মাদয়ানবাসী হোক বা ইসমাঈলী উভয়েরই তাদের পরিবারের সাথে নিকট সম্পর্ক ছিল। মিসরবাসীরাও তো কমপক্ষে হযরত ইবরাহীম সম্পর্কে বেখবর ছিল না। (বরং হযরত ইউসুফ যেভাবে তাঁদের এবং হযরত ইয়াকূব ও ইসহাকের কথা বলেছেন তাতে অনুমান করা যায় এ তিনজন মনীষীর খ্যাতি মিসরে পৌঁছে গিয়েছিল।) কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ) বিগত চার পাঁচ বছর ধরে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে থেকেছেন তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কখনো নিজের বাপ–দাদাদের নাম নেননি। সম্ভবত তিনি নিজেও জানতেন, আল্লাহ তাঁকে যা কিছু বানাতে চান সে জন্য তাঁকে এসব অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এখন শুধুমাত্র নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের খাতিরে তিনি এ সত্যটি সামনে তুলে ধরলেন যে, তিনি কোন নতুন ও অভিনব দীন পেশ করছেন না বরং তাওহীদ প্রচারের এমন একটি বিশ্বজনীন আন্দোলনের সাথে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে যার নেতা হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব আলাইহিমুস সালাম। তাঁর এমনটি করা এ জন্য জরুরী ছিল যে, সত্য দীনের আহবায়ক কখনো "আমি একটি নতুন কথা বলছি যা এর আগে কেউ বলেনি" এ ধরনের দাবীর মাধ্যমে তাঁর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন না। বরং প্রথম পদক্ষেপেই তিনি একথা পরিষ্কার করে বলে দেন যে, তিনি একটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সত্যের দিকে আহবান জানাচ্ছেন, যা ইতিপূর্বে সবসময়ই সকল সত্যপন্থী পেশ করে এসেছেন।

তিন ঃ তারপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিজের বক্তব্য পেশ করার জন্য যেভাবে সুযোগ সৃষ্টি করেছেন তা থেকে আমরা প্রচার কৌশলের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করি। দু'জন লোক তাদের স্বপ্ন বর্ণনা করছে। তারা নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা প্রকাশ করে তার তা'বীর জিজ্ঞেস করছে। জবাবে তিনি বলছেন, তা'বীর তো আমি অবশ্যি বলবো কিন্তু তার আগে শুনে রাখো, যে জ্ঞানের মাধ্যমে আমি তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেবো তার উৎস কি? এভাবে তাদের কথার মধ্য থেকে নিজের কথা বলার সুযোগ সৃষ্টি করে তিনি তাদের সামনে নিজের দীন পেশ করতে থাকেন। এ থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি সত্য প্রচারের ফিকিরে লেগে যায় এবং সে সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিরও অধিকারী হয় তাহলে কেমন চমৎকারভাবে আলোচনার মোড় নিজের দিকে ফিরিয়ে নিতে পারে। যে ব্যক্তি দাওয়াত দেবার ধান্দায় থাকে না তার সামনে সুযোগের পর সুযোগ

আসতে থাকে কিন্তু কোন সুযোগেই সে নিজের কথা পেশ করার প্রয়োজন অনুভব করে না। কিন্তু যার এ ধান্দা থাকে, সে সুযোগের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকে এবং সুযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই নিজের কাজ শুরু করে দেয়। তবে বিচক্ষণ ও জ্ঞানী প্রচারকের সুযোগ সন্ধান এবং নির্বোধ ও অবিবেচক প্রচারকের সুযোগ সন্ধানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। নির্বোধ প্রচারক পরিবেশ–পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি না রেখে লোকদের কানে জোরপূর্বক নিজের দাওয়াত ঠেসে দেবার চেষ্টা করে তারপর অনর্থক তর্কবিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে তাদের মনে নিজের দাওয়াতের প্রতি উল্‌টো বিরক্তির সৃষ্টি করে।

চার ঃ লোকদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করার সঠিক পদ্ধতি কি, একথাও এখান থেকে জানা যেতে পারে। হযরত ইউসুফ (আ) সুযোগ পেতেই ইসলামের বিস্তারিত বিধান ও নীতিগুলো পেশ করতে শুরু করেননি। বরং শ্রোতাদের সামনে দীনের এমন একটি সূচনা বিন্দু তুলে ধরেন যেখান থেকে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের পথ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অর্থাৎ তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। আবার এ পার্থক্যকে এমন যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট করেছেন যার ফলে সাধারণ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তিই তা অনুভব না করে পারেন না। বিশেষ করে সে সময় যাদেরকে সম্বোধন করে তিনি একথা বলছিলেন তাদের মন–মস্তিষ্কে তীরের মতো একথা গেঁথে গিয়ে থাকবে। কারণ তারা ছিল কর্মজীবী গোলাম। নিজেদের মনের গভীরে তারা একথা ভালোভাবে অনুভব করতো যে, একজন প্রভুর গোলাম হওয়া ভালো, না একাধিক প্রভুর গোলাম হওয়া আর সারা দুনিয়ার একক প্রভু যিনি, তার বন্দেগী করা ভালো, না তার বান্দাদের বন্দেগী করা? তারপর তিনি একথাও বলেন না যে, তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করো এবং আমার দীন গ্রহণ করো। বরং এক বিচিত্র ভংগীতে বলছেন, আল্লাহর কতবড় মেহেরবানী, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারো বান্দা হিসেবে পয়দা করেননি, অথচ অধিকাংশ লোক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না বরং অনর্থক নিজেরাই মনগড়া রব তৈরী করে তাদের পূজা ও বন্দেগী করছে। তারপর তিনি শ্রোতাদের অনুসৃত ধর্মের সমালোচনাও করছেন কিন্তু অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবে এবং কোন প্রকার মনোকষ্ট না দিয়ে। তিনি এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, এই যেসব মাবুদ–যাদের কাউকে তোমরা অন্নদাতা, কাউকে অনুগ্রহদাতা ও করুণানিধান, কাউকে ভূমির অধিপতি এবং কাউকে ধন–সম্পদের মালিক অথবা স্বাস্থ্য ও রোগের একচ্ছত্র অধিপতি ও পরিচালক ইত্যাদি বলে থাকো—এরা নিছক কিছু অন্তসারশূন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোন সত্যিকার অন্নদাতা, অনুগ্রহকারী, মালিক ও প্রভুর অস্তিত্ব নেই। আসল মালিক ও প্রভু হচ্ছেন মহান আল্লাহ, যাকে তোমরাও বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে স্বীকার করে থাকো। তিনি এসব মালিক ও প্রভুদের কাউকে মালিকানা, প্রভুত্ব ও উপাস্য হবার ছাড়পত্র দেননি। তিনি সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় অধিকার ও ক্ষমতা নিজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং তাঁরই আদেশ হচ্ছে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো বন্দেগী করবে না।

পাঁচ ঃ হযরত ইউসুফ (আ) কারাগারের এ আট দশ বছরের জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছেন এ থেকে একথাও অনুমান করা যেতে পারে। লোকেরা মনে করে, কুরআনে যেহেতু তাঁর শুধু একটি মাত্র ভাষণের উল্লেখ আছে কাজেই তিনি কেবল একবারই

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٥﴾

৬ রুকূ’

একদিন[৩৬] বাদশাহ বললো, “আমি স্বপ্ন দেখেছি, সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি পাতলা গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও সাতটি শুকনো শীষ। হে সভাসদবৃন্দ! আমাকে এ স্বপ্নের তা’বীর বলে দাও, যদি তোমরা স্বপ্নের মানে বুঝে থাকো।”[৩৭] লোকেরা বললা, “এসব তো অর্থহীন স্বপ্ন, আর আমরা এ ধরনের স্বপ্নের মানে জানি না।”

সেই দু’জন কয়েদীর মধ্য থেকে যে বেঁচে গিয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে এখন যার মনে পড়েছিল, সে বললো, “আমি আপনাদের এর তা’বীর বলে দিচ্ছি, আমাকে একটু (কারাগারে ইউসুফের কাছে) পাঠিয়ে দিন।”[৩৮]

দীনের দাওয়াত দেবার জন্য মুখ খুলেছিলেন। কিন্তু প্রথমত নবী তাঁর আসল কাজ থেকে গাফেল ছিলেন, একজন নবী সম্পর্কে এ ধারণা করা মারাত্মক ধরনের কুধারণার পর্যায়ভুক্ত। তারপর যে ব্যক্তির সত্যদীন প্রচারের আগ্রহ ও ফিকির এত বেশী প্রবল ছিল যে, দু’জন লোক স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতেই তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের কাছে দীনের তাবলীগ করতে শুরু করে দেন, তাঁর সম্পর্কে কেমন করে এ ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি কারাবাসের এ কয়েক বছর নীরবে কাটিয়ে দিয়েছিলেন?

৩৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, “শয়তান হযরত ইউসুফকে তাঁর রবের (অর্থাৎ আল্লাহর) স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এবং তিনি এক বান্দার কাছে চান যে, সে তার রবের (মিসরের বাদশাহর) কাছে তার কথা আলোচনা করে তার কারামুক্তির চেষ্টা করুক, তাই আল্লাহ তাঁকে কয়েক বছর জেলখানা পড়ে থাকার শাস্তি দেন।” মূলত এটি পুরোপুরি একটি ভুল ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, যেমন আল্লামা ইবনে কাসীর এবং প্রথম যুগের তাফসীরকারদের মধ্যে মুজাহিদ, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইত্যাদি তাফসীরকারগণ বলেন, فانساه الشيطان ذكر ربه (শয়তান তাকে ভুলিয়ে দেয় তার রবের বা প্রভুর স্মরণ) এর মধ্যে “তার” বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যার সম্পর্কে হযরত ইউসুফের

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنۢبُلَٰتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٍ لَّعَلِّىٓ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

সে গিয়ে বললো, "হে সত্যবাদিতার প্রতীক ইউসুফ![৩৯] আমাকে এ স্বপ্নের অর্থ বলে দাও ঃ সাতটি মোটা গাভীকে সাতটি পাতলা গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি শীষ সবুজ ও সাতটি শীষ শুকনো সম্ভবত আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারবো এবং তারা জানতে পারবে।"[৪০]

ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে এবং এ আয়াতের মানে হচ্ছে, "শয়তান তার প্রভুর কাছে হযরত ইউসুফের বিষয়টা উথাপন করার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল।" এ প্রসংগে একটি হাদীসও পেশ করা হয়। হাদীসটিতে বলা হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে কথা বলেছিলেন সে কথা যদি তিনি না বলতেন তাহলে তিনি কয়েক বছর কারাগারে আটক থাকতেন না।" কিন্তু আল্লামা ইবনে কাসীর বলেছেন ঃ "এ হাদীস যে ক'টি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে সব কটিই দুর্বল। কোন কোন সূত্রে এটি "মরফূ" হাদীস। সেখানে বর্ণনাকারী হচ্ছে সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী' ও ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ। এরা উভয়ই অনির্ভরযোগ্য। আবার কোন কোন সূত্রে এটি "মুরসাল" হাদীস। কিন্তু এ ধরনের বিষয়ে মুরসাল হাদীসের ওপর ভরসা করা যেতে পারে না।" এ ছাড়া একজন মজলুম ব্যক্তি নিজের মুক্তির জন্য পার্থিব পন্থা অবলম্বন করাকে আল্লাহ থেকে গাফলতির ও তাঁর প্রতি অনির্ভরশীলতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা হবে—একথা যুক্তির দিক দিয়েও গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৬. মাঝখানে কারাগার জীবনের কয়েক বছরের অবস্থা বাদ দিয়ে এখন হযরত ইউসুফের পার্থিব উন্নতির সূচনা লগ্নের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়েছে।

৩৭. বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনা মতে এ স্বপ্ন দেখার পর বাদশাহ বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে নিজের রাজ্যের বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল গোষ্ঠী, জ্যোতিষী, গণক, ধর্মীয় নেতা ও যাদুকরদের একত্র করে তাদের সবার সামনে এ স্বপ্ন পেশ করেছিলেন।

৩৮. কুরআন এখানে ঘটনার আলোচনা সংক্ষেপে সেরে দিয়েছে। বাইবেল ও তালমূদে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে (বস্তুত যুক্তির আলোকে এ বিবরণই সঠিক মনে হয়।) তা হচ্ছে এই ঃ মদ পরিবেশকদের সরদার ইউসুফ আলাইহিস সালামের অবস্থা বাদশাহর কাছে বর্ণনা করে এবং এ সংগে জেলখানায় তাদের স্বপ্ন এবং হযরত ইউসুফ (আ) তার যে তা'বীর করেছিলেন আর এ তা'বীর যেভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে তা সবই তার সামনে তুলে ধরে। শেষে সে বাদশাহর কাছে আবেদন করে, আমি জেলখানায় গিয়ে তাঁর কাছ থেকে এর তা'বীর জিজ্ঞেস করে আসবো, আমাকে সেখানে যাবার অনুমতি দেয়া হোক।

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا
قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ
عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿٤٩﴾

ইউসুফ বললো, "তোমরা সাত বছর পর্যন্ত লাগাতার চাষাবাদ করতে থাকবে। এ সময় তোমরা যে ফসল কাটবে তা থেকে সামান্য পরিমাণ তোমাদের আহারের প্রয়োজনে বের করে নেবে এবং বাদবাকি সব শীষ সমেত রেখে দেবে। তারপর সাতটি বছর আসবে বড়ই কঠিন। এ সময়ের জন্য তোমরা যে শস্য জমা করবে তা সমস্ত এ সময়ে খেয়ে ফেলা হবে। যদি কিছু বেঁচে যায় তাহলে তা হবে কেবলমাত্র সে টুকুই যা তোমরা সংরক্ষণ করবে। এরপর আবার এক বছর এমন আসবে যখন রহমতের বৃষ্টি ধারার মাধ্যমে মানুষের আবেদন পূর্ণ করা হবে এবং তারা রস নিংড়াবে।[৪১]

৩৯. মূল ভাষ্যে صديق শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি আরবী ভাষায় সর্বোচ্চ মানের সততা ও সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, কারাগারে অবস্থানকালে এ ব্যক্তি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্র জীবন ও চরিত্র দ্বারা কী বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছিল! দীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরও এ প্রভাব কেমন অটুট ছিল! "সিদ্দীক" শব্দটির আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন সূরা নিসার ৯৯ টীকা।

৪০. অর্থাৎ তারা আপনার মর্যাদা ও মূল্য বুঝতে পারবে। তারা অনুভব করতে পারবে কত উঁচুদরের ব্যক্তিত্বকে তারা কোথায় আটকে রেখেছে। এভাবে আপনার সাথে কারাবাসের সময় আমি যে ওয়াদা করেছিলাম তা পূর্ণ করার সুযোগ আমি পেয়ে যাবো।

৪১. মূল ভাষ্যে يعصرون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শাব্দিক মানে হচ্ছে 'নিংড়ানো'। এখানে এর মাধ্যমে পরবর্তীকালের চতুরদিকের এমন শষ্য শ্যামল তরতাজা পরিবেশ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যা দুর্ভিক্ষের পর রহমতের বৃষ্টিধারা ও নীলনদের জোয়ারের পানি সিঞ্চনের মাধ্যমে সৃষ্টি হবে। জমি ভালোভাবে পানিসিক্ত হলে তেল উৎপাদনকারী বীজ, রসাল ফল ও অন্যান্য ফলফলাদি বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ভালো ঘাস খাওয়ার কারণে গৃহপালিত পশুরাও প্রচুর পরিমাণে দুধ দেয়।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ তা'বীরে শুধুমাত্র বাদশাহর স্বপ্নের অর্থ বর্ণনা করেই ক্ষান্ত থাকেননি বরং তিনি এ সংগে প্রাচুর্যের প্রথম সাত বছরে আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা ও শস্য সংরক্ষণ করার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি দুর্ভিক্ষের পরে সুদিন আসার সুখবরও দিয়েছেন অথচ বাদশাহর স্বপ্নে এর কোন উল্লেখ ছিল না।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ۭ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ۭ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْۗءٍ ۭ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۡ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَاۗىِٕنِيْنَ ۝

৭ রুকূ'

বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে আনো।" কিন্তু বাদশাহর দূত যখন ইউসুফের কাছে পৌছুল তখন সে বললো,[৪২] তোমার প্রভুর কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো, যে মহিলারা হাত কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারটা কি? আমার রব তো তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত।"[৪৩] একথায় বাদশাহ সেই মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করলো,[৪৪] "তোমরা যখন ইউসুফকে অসৎকাজে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলে তোমাদের তখনকার অভিজ্ঞতা কি?" সবাই একবাক্যে বললো, "আল্লাহর কী অপার মহিমা! আমরা তার মধ্যে অসৎ প্রবণতার গন্ধই পাইনি।" আযীযের স্ত্রী বলে উঠলো, "এখন সত্য প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে ফুসলাবার চেষ্টা করেছিলাম, নিসন্দেহে সে একদম সত্যবাদী।"[৪৫]

(ইউসুফ বললো ঃ)[৪৬] "এ থেকে আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আযীয জানতে পারুক, আমি তার অবর্তমানে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাস ঘাতকতাকারীদের চক্রান্ত সফল করেন না।

৪২. এখান থেকে শুরু করে বাদশাহর সাথে সাক্ষাত পর্যন্ত আলোচনাটি এ কাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এ সম্পর্কে যাকিছু কুরআনে বর্ণিত হয়েছে তার কোন উল্লেখ বাইবেল ও তালমূদে নেই। বাইবেলে বলা হয়েছে, বাদশাহর ডাকে হযরত ইউসুফ (আ) সংগে সংগেই চলে আসার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি ক্ষৌরকর্ম শেষ করলেন, পোশাক বদলালেন এবং রাজ দরবারে হাযির হয়ে গেলেন। তালমূদ এর চাইতেও নিকৃষ্ট ভংগীতে

এ ঘটনাকে পেশ করেছে। তার বর্ণনামতে, "বাদশাহ তার কর্মচারীদেরকে হুকুম দিলেন, ইউসুফকে আমার সামনে হাজির করো এবং এ সংগে এও নির্দেশ দিলেন যে, দেখো এমন কোন কাজ করো না যাতে ছেলেটি ভয় পেয়ে যায় এবং সঠিক তা'বীর দিতে না পারে। কাজেই রাজ কর্মচারীরা হযরত ইউসুফকে কারাগার থেকে বের করলো। তাঁর ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করলো, পোশাক বদলালো এবং দরবারে নিয়ে এলো। বাদশাহ নিজের সিংহাসনে বসেছিলেন। সেখানে হীরা, মুক্তা, মনি–মাণিক্যের চোখ ধাঁধানো দৃশ্য ও দরবারের শান–শওকত দেখে ইউসুফ হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং তাঁর দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেলো। বাদশাহর সিংহাসনের সাতটি সিঁড়ি ছিল। নিয়ম ছিল, যখন কোন সম্মানিত ও মর্যাদাশালী ব্যক্তি কিছু বলতে চাইতেন তখন ছয়টি সিঁড়ি চড়ে ওপরে যেতেন এবং বাদশাহর সাথে কথা বলতেন। আর যখন নিম্ন শ্রেণীর কোন ব্যক্তিকে বাদশাহর সাথে কথা বলার জন্য ডাকা হতো তখন সে নিচে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং বাদশাহ তৃতীয় সিঁড়িতে নেমে এসে তার সাথে কথা বলতেন। এ নিয়ম মোতাবেক ইউসুফ নীচে দাঁড়িয়ে ভূমি চুম্বন করে বাদশাহকে সালামী দিলেন এবং বাদশাহ তৃতীয় সিঁড়িতে নেমে এসে তাঁর সাথে কথা বললেন।" এ চিত্রে বনী ইসরাঈল তার মহান মর্যাদাশালী পয়গম্বরকে যেভাবে হেয় করে পেশ করেছে তা চোখের সামনে রেখে কুরআন তাঁর কারাগার থেকে বের হওয়া এবং বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করার ঘটনাকে যে মর্যাদাপূর্ণ ও গৌরবময় ভংগীতে পেশ করেছে তা একবার পর্যালোচনা করে দেখুন। এখন একজন বিবেকবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এ ফায়সালা করতে পারেন যে, এ দু'টি চিত্রের মধ্যে কোন্ চিত্রটি নবুওয়াতের মর্যাদার সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। তাছাড়া সাধারণ বিচার বুদ্ধির দৃষ্টিতেও একথাটি ত্রুটিপূর্ণ মনে হয় যে, বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত যদি হযরত ইউসুফ এতই নিকৃষ্ট মর্যাদার অধিকারী থেকে থাকেন যেমন তালমূদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাহলে স্বপ্নের তা'বীর শুনার পর অকস্মাত তাঁকে একেবারে সমগ্র রাজ্যের সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী করে দেয়া হলো কেমন করে? একটি উন্নত ও সুসভ্য দেশে এতবড় মর্যাদা মানুষ তখনই লাভ করে যখন সে লোকদের কাছে নিজের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে দেয়। কাজেই বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও বাইবেল ও তালমূদের তুলনায় কুরআনের বর্ণনাই বাস্তবতার সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল মনে হয়।

৪৩. অর্থাৎ আমার রব আল্লাহ তো আগে থেকেই জানেন যে, আমি নিরপরাধ। কিন্তু তোমাদের রব অর্থাৎ বাদশাহেরও আমার মুক্তির পূর্বে যে কারণে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে সে ব্যাপারটির পুরোপুরি অনুসন্ধান করে নেয়া উচিত। কারণ আমি কোন সন্দেহ ও অপবাদের কলংক মাথায় নিয়ে মানুষের সামনে যেতে চাই না। আমাকে মুক্তি দিতে চাইলে আগে আমি যে নিরপরাধ ছিলাম একথাটি সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হওয়া উচিত। আসল অপরাধী ছিল তোমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। তারা নিজেদের স্ত্রীদের অসচ্চরিত্রতার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে আমার নিরপরাধ সত্তা ও নিষ্কলংক চরিত্রের ওপর।

হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর এ দাবীকে যে ভাষায় পেশ করেছেন তা থেকে সুস্পষ্টভাবে একথা প্রকাশিত হয় যে, আযীযের স্ত্রীর ভোজের মজলিসে যে ঘটনা ঘটেছিল সে সম্পর্কে মিসরের বাদশাহ পুরোপুরি অবগত ছিলেন। বরং সেটি এমনি একটি বহুল প্রচারিত ঘটনা ছিল যে, সেদিকে কেবলমাত্র একটি ইংগিতই যথেষ্ট ছিল।

তারপর এ দাবীতে হযরত ইউসুফ (আ) আযীযের স্ত্রীকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যে মহিলাগুলো আংগুল কেটে ফেলেছিল তাদের ব্যাপারটি উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এটি তাঁর চরম ভদ্রতা ও উন্নত হৃদয়বৃত্তির আর একটি প্রমাণ। আযীযের স্ত্রী তাঁর সাথে যে পর্যায়ের অসদ্ব্যবহার করে থাকুক না কেন তবুও তার স্বামী তাঁর উপকার করেছিলেন। তাই তাঁর ইজ্জত–আবরুর ওপর হামলা করে কোন কথা তিনি বলতে চাননি।

৪৪. সম্ভবত শাহীমহলে এ মহিলাদেরকে ডেকে এনে এ জবানবন্দী নেয়া হয়েছিল। আবার এও হতে পারে যে, বাদশাহ নিজের কোন বিশেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে এ স্বীকারোক্তি আদায় করেছিলেন।

৪৫. অনুমান করা যেতে পারে, এ স্বীকারোক্তিগুলো কিভাবে আট নয় বছর আগের ঘটনাবলীকে আবার নতুন করে তরতাজা করে দিয়েছিল, কিভাবে হযরত ইউসুফের ব্যক্তিত্ব কারাজীবনের দীর্ঘকালীন বিস্মৃতির পর আবার অকস্মাত বিপুলভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, কিভাবে মিসরের সমস্ত অভিজাত, মর্যাদাশালী ও মধ্যবিত্ত সমাজে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাঁর নৈতিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ওপরে বাইবেল ও তালমূদের বরাত দিয়ে একথা বলা হয়েছে যে, বাদশাহ সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে সারা দেশের জ্ঞানী–গুণী, আলেম ও পীরদের একত্র করেছিলেন এবং তারা সবাই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হয়েছিল। এরপর হযরত ইউসুফ (আ) এর ব্যাখ্যা করেছিলেন। এ ঘটনার ফলে সারা দেশের জনতার দৃষ্টি আগে থেকেই তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হয়েছিল। তারপর বাদশাহর তলবনামা পেয়ে যখন তিনি জেলখানা থেকে বাইরে আসতে অস্বীকার করলেন তখন সমগ্র দেশবাসী অবাক হয়ে গিয়েছিল যে, এ আবার কেমন অদ্ভুত প্রকৃতির উচ্চ মনোবল সম্পন্ন মানুষ, যাকে আট নয় বছরের কারাবাসের পর বাদশাহ নিজেই মেহেরবানী করে ডাকছেন এবং তারপরও তিনি ব্যাকুল চিত্তে দৌড়ে আসছেন না। তারপর যখন তারা ইউসুফের নিজের কারামুক্তির এবং বাদশাহর সাথে দেখা করতে আসার জন্য পেশকৃত শর্তাবলী শুনলো তখন সবার দৃষ্টি এ অনুসন্ধান ও তদন্তের ফলাফলের প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়ে রইল। এরপর যখন লোকেরা এর ফলাফল শুনলো তখন দেশের আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা এই বলে বাহ্‌বা দিল যে, আহা, এ ব্যক্তি কেমন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন ও চরিত্রের অধিকারী। কাল যারা নিজেদের সমবেত প্রচেষ্টায় তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছিল আজ তাঁর চারিত্রিক নিষ্কলুষতার পক্ষে তারাই সাক্ষ দিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে একথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, সে সময় হযরত ইউসুফের উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠার জন্য কেমন অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়ে গিয়েছিল। এরপর বাদশাহর সাথে সাক্ষাতের সময় হযরত ইউসুফ হঠাৎ কেমন করে তাঁকে দেশের অর্থ–সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব দান করার দাবী জানিয়েছিলেন এবং বাদশাহ কেন নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করে নিয়েছিলেন একথা আর মোটেই বিস্ময়কর ঠেকে না। ব্যাপার যদি শুধু এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো যে কারাগারের একজন বন্দী বাদশাহর একটি স্বপ্নের তা'বীর বলে দিয়েছিলেন তাহলে এ জন্য তিনি বড়জোর কোন পুরস্কারের এবং কারাগার থেকে মুক্তিলাভের অধিকারী হতে পারতেন। কিন্তু শুধুমাত্র এতটুকুন কথায় তিনি বাদশাহকে বলবেন "আমাকে দেশের যাবতীয় অর্থ–সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব দান করো" এবং বাদশাহ বলে দেবেন "নাও, সবকিছু তোমার জন্য হাযির"—এটা যথেষ্ট হতে পারতো না।

৪৬. একথা সম্ভবত হযরত ইউসুফ তখনই বলে থাকবেন যখন কারাগারে তাঁকে তদন্তের ফলাফল জানিয়ে দেয়া হয়ে থাকবে। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাসীরের মতো বড় বড় মুফাস্‌সিরসহ আরো কোন কোন তাফসীরকার এ বাক্যটিকে হযরত ইউসুফের নয় বরং আযীযের স্ত্রীর বক্তব্যের অংশ হিসেবে গণ্য করেছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এ বাক্যটি আযীযের স্ত্রীর উক্তির সাথে সংযুক্ত এবং মাঝখানে এমন কোন শব্দ নেই যা থেকে একথা মনে করা যেতে পারে যে, انه لمن الصادقين এ এসে আযীযের স্ত্রীর কথা শেষ হয়ে গেছে এবং পরবর্তী কথা হযরত ইউসুফ বলেছেন। তাঁরা বলেন, দু'টি লোকের কথা যদি পরস্পরের সাথে সংলগ্ন থাকে এবং এটা অমুকের কথা ও ওটা অমুকের কথা—এ বিষয়টি যদি সুস্পষ্ট না থাকে তাহলে এ অবস্থায় অবশ্যি এমন কোন চিহ্ন থাকা উচিত যা উভয় কথার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। কিন্তু এখানে এ ধরনের কোন পার্থক্য চিহ্ন নেই। কাজেই একথা মেনে নিতে হবে যে الئن حصحص الحق থেকে শুরু করে ان ربى غفور رحيم পর্যন্ত সম্পূর্ণ বক্তব্যটি আযীযের স্ত্রীর। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি, এ বিষয়টি কেমন করে ইবনে তাইমিয়ার মতো সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরও দৃষ্টির আগোচরে থেকে গেলো যে, কথা বলার ধরন ও ভংগী নিজেই একটি বড় পার্থক্য চিহ্ন এবং এর উপস্থিতিতে আর কোন পার্থক্য চিহ্নের প্রয়োজনই হয় না। প্রথম বাক্যটি অবশ্যি আযীযের স্ত্রীর মুখে সাজে কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটিও কি তার মুখে খাপ খায়? দ্বিতীয় বাক্যের প্রকাশভংগী তো পরিষ্কার জানাচ্ছে যে, আযীযের স্ত্রী নয় হযরত ইউসুফই তার প্রবক্তা। এ বাক্যে যে সৎহৃদয়বৃত্তি, উচ্চ মনোভাব, বিনয় ও আল্লাহভীতি সোচ্চার তা নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে যে, তা এমন এক নারীর কন্ঠে উচ্চারিত হতে পারে না যে কণ্ঠে ইতিপূর্বে هيت لك (এসে যাও) উচ্চারিত হয়েছিল, যে কণ্ঠ থেকে ইতিপূর্বে বের হয়েছিল ما جزاء من اراد باهلك سوء (যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীকে কুকর্মে লিপ্ত করতে চায় তার শাস্তি কি?) এর মতো মিথ্যা ভাষণ এবং যে কণ্ঠে প্রকাশ্য মাহফিলে لئن لم يفعل ما امره ليسجنن (যদি সে আমার কথা মতো কাজ না করে তাহলে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে)–এর মতো হুমকি উচ্চারিত হয়েছিল। এমন ধরনের পবিত্র বাক্য কেবলমাত্র এমনি এক কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারতো যে কণ্ঠে ইতিপূর্বে معاذ الله انه ربى احسن مثواى (আল্লাহর পানাহ চাই, তিনি আমার রব, তিনি আমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন) এ ধরনের সকৃতজ্ঞ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, যে কণ্ঠ ইতিপূর্বে رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِىْ إِلَيْهِ (হে আমার রব! এরা আমাকে যে পথে চলার জন্য ডাকছে তার চেয়ে কারাগার আমার কাছে ভালো।)–এর মতো সৎপথে অটল থাকার দৃঢ় মনোবৃত্তির ঘোষণা দিয়েছিল এবং যে কণ্ঠ ইতিপূর্বে اِلَّا تَصْرِفْ عَنِّىْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ (হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে উদ্ধার না করো তাহলে আমি তাদের জালে আটকে যাবো)–এর মতো সমর্পিত প্রাণ বান্দার আকুতি ধ্বনিত হয়েছিল। এ ধরনের পবিত্র বাণীকে সত্যনিষ্ঠ–সত্যবাদী ইউসুফের পরিবর্তে আযীযের স্ত্রীর উক্তি বলে মেনে নেয়া ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এমন কোন আলামত বা চিহ্ন না পাওয়া যায় যা থেকে প্রমাণ হয় এ পর্যায়ে পৌঁছে আযীযের স্ত্রী তাওবা করে ঈমান এনেছিল এবং নিজের প্রবৃত্তি ও আচরণ সংশোধন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন কোন আলামত ও নিদর্শন পাওয়া যায় না।

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

আমি নিজের নফ্সকে দোষমুক্ত করছি না। নফ্স তো খারাপ কাজ করতে প্ররোচিত করে, তবে যদি কারোর প্রতি আমার রবের অনুগ্রহ হয় সে ছাড়া। অবশ্যি আমার রব বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"

বাদশাহ বললো, "তাকে আমার কাছে আনো, আমি তাকে একান্তভাবে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব।"

ইউসুফ যখন তার সাথে আলাপ করলো, সে বললো, "এখন আপনি আমাদের এখানে সম্মান ও মর্যদার অধিকারী এবং আপনার আমানতদারীর ওপর পূর্ণ ভরসা আছে।"[৪৭] ইউসুফ বললো, "দেশের অর্থ–সম্পদ আমার হাতে সোপর্দ করুন। আমি সংরক্ষণকারী এবং জ্ঞানও রাখি।"[৪৭(ক)]

৪৭. এটা যেন বাদশাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে একটি সুস্পষ্ট ইংগিত ছিল যে, আপনার হাতে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সোপর্দ করা যেতে পারে।

৪৭(ক). এর আগে যেসব আলোচনা হয়েছে তার আলোকে পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, কোন পদলোভী ব্যক্তি বাদশাহর ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই যেমন কোন পদলাভের জন্য আবেদন করে বসে এটি তেমনি ধরনের কোন চাকরির আবেদন ছিল না। আসলে এটি ছিল একটি বিপ্লবের দরজা খোলার জন্য সর্বশেষ আঘাত। হযরত ইউসুফের নৈতিক শক্তির বলে বিগত দশ–বারো বছরের মধ্যে এ বিপ্লব ক্রমবিকাশ লাভ করে আত্মপ্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল এবং এখন এর দরজা খোলার জন্য শুধুমাত্র একটি হাল্‌কা আঘাতের প্রয়োজন ছিল। হযরত ইউসুফ (আ) একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পরীক্ষার অংগন অতিক্রম করে আসছিলেন। কোন অজ্ঞাত স্থানে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং বাদশাহ থেকে শুরু করে মিসরের আবাল–বৃদ্ধ–বনিতা সবাই এ সম্পর্কে অবগত ছিল। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি একথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, আমানতদারী, সততা, ধৈর্য, সংযম, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার ক্ষেত্রে অন্তত সমকালীন লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ব্যক্তিত্বের এ গুণগুলো এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে, এগুলো অস্বীকার করার সাধ্য কারোর ছিল না। দেশবাসী মুখে এগুলোর পক্ষে সাক্ষ দিয়েছিল। তাদের হৃদয়

এগুলোর দ্বারা বিজিত হয়েছিল। বাদশাহ নিজেই এগুলোর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এখন তাঁর "সংরক্ষণকারী" ও "জ্ঞানী" হওয়া শুধুমাত্র একটি দাবীর পর্যায়ভুক্ত ছিল না বরং এটি ছিল একটি প্রমাণিত ঘটনা। সবাই এটা বিশ্বাস করতো। এখন শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কর্তৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফের সম্মতিটুকুই বাকি ছিল। বাদশাহ, তাঁর মন্ত্রী পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ একথা ভালোভাবেই জেনেছিলেন যে, তিনি ছাড়া এ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করার মতো আর দ্বিতীয় কোন যোগ্য ব্যক্তিত্বই নেই। কাজেই নিজের এ উক্তির সাহায্যে তিনি এ সম্মতিটুকুরই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন মাত্র। তাঁর কন্ঠে এ দাবীটুকু উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই বাদশাহ ও তাঁর রাজ পরিষদ যেভাবে দু'হাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করে নিয়েছেন তা একথাই প্রমাণ করে যে, ফল পুরোপুরি পেকে গিয়েছিল এবং তা ছিঁড়ে পড়ার জন্য শুধুমাত্র একটা ইশারার অপেক্ষায় ছিল। (তালমূদের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করার ফায়সালাটি কেবল বাদশাহ একাই করেননি। বরং সমগ্র রাজপরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ) এই যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব চান এবং যা তাকে দেয়া হয়, এটা কোন্ ধরনের ছিল? অজ্ঞ লোকেরা এখানে خزائن ارض (দেশের ধন–সম্পদ) শব্দ এবং পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রসর হয়ে খাদ্য বন্টনের ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখে মনে করেন সম্ভবত তিনি ধনভাণ্ডারের কর্তা, অর্থ বিভাগীয় কর্মকর্তা, দুর্ভিক্ষ কমিশনার, অর্থমন্ত্রী অথবা খাদ্য মন্ত্রী ধরনের একটা কিছু ছিলেন। কিন্তু কুরআন, বাইবেল ও তালমূদের সম্মিলিত সাক্ষ হচ্ছে এই যে, আসলে ইউসুফকে মিসর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্বের আসনে (রোমীয় পরিভাষায় ডিকটেটর) অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁকে দান করা হয়েছিল। কুরআন বলছে, হযরত ইয়াকুব (আ) যখন মিসরে পৌঁছলেন তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম সিংহাসনে বসেছিলেন ورفع ابويه على العرش এবং তিনি নিজের পিতামাতাকে তাঁর পাশে সিংহাসনে বসালেন)। হযরত ইউসুফের মুখ নিঃসৃত এ বাণী কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ "হে আমার রব! তুমি আমাকে বাদশাহী দান করেছো।" (رب قد اتيتنى من الملك) আবার আল্লাহ মিসরে তাঁর কর্তৃত্বের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করছেন যেন সমগ্র মিসর তাঁর অধীনে ছিল (يتبوا منها حيث يشاء) অন্যদিকে বাইবেল সাক্ষ দিচ্ছে ঃ

"তুমিই আমার বাটির অধ্যক্ষ হও, আমার সমস্ত প্রজা তোমার বাক্য শিরোধার্য করিবে, কেবল সিংহাসনে আমি তোমা হইতে বড় থাকিব।"........ দেখো, আমি তোমাকে সমস্ত মিসর দেশের উপরে নিযুক্ত করিলাম।.......তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে সমস্ত মিসর দেশে কোন লোক হাত কি পা তুলিতে পারিবে না। আর ফেরাউন যোসেফের নাম সাফনৎ পানেহ (দুনিয়ার মুক্তিদাতা) রাখিলেন।" (আদি পুস্তক ৪১ ঃ ৪০–৪৫)

আবার তালমূদ বলছে, ইউসুফের ভাইয়েরা মিসর থেকে ফিরে গিয়ে মিসরের শাসন–কর্তার (ইউসুফ) প্রশংসা করে বলে ঃ

"দেশের অধিবাসীদের ওপর তিনি সর্বোচ্চ কর্তৃত্বশালী। তাঁর হুকুমে তারা বের হয় এবং তাঁর হুকুমে প্রবেশ করে তাঁর কণ্ঠ সারা দেশ শাসন করে। কোন ব্যাপারেই তাঁর ফেরাউনের অনুমতির প্রয়োজন হয় না।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, হযরত ইউসুফ কি উদ্দেশ্যে এ কর্তৃত্ব চেয়েছিলেন? তিনি কি একটি কাফের সরকারের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত কুফরী নীতি ও আইনের ভিত্তিতেই পরিচালনা করার জন্য কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা চেয়েছিলেন? অথবা তাঁর সামনে এ লক্ষ্য ছিল যে, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব লাভ করার পর দেশের তামাদ্দুনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী নীতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজাবেন? এর সবচেয়ে চমৎকার জবাব আল্লামা যামাখ্শারী তাঁর তাফসীর "কাশ্শাফ" গ্রন্থে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

> "হযরত ইউসুফ اجعلنى على خزائن الارض বলেছেন। একথা বলার পেছনে তাঁর কেবল এতটুকুই উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁকে আল্লাহর বিধান জারি ও সত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ন্যায় ও ইনসাফের সুফল চতুরদিকে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ দেয়া হোক। আর যেসব কাজের জন্য নবীদেরকে পাঠানো হয়ে থাকে সেগুলো সম্পন্ন করার জন্য তিনি শক্তি অর্জন করবেন। তিনি রাজত্বের লোভে বা কোন বৈষয়িক লালসার বসবর্তী হয়ে এ দাবী করেননি। বরং তিনি ছাড়া আর কেউ এ কাজ করতে পারবে না একথা জেনেই এ দাবী করেছিলেন।"

আর সত্যি বলতে কি, এ প্রশ্নটি আসলে অন্য একটি প্রশ্নের জন্ম দেয়। সেটি অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্ন। সেটি হচ্ছে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবীই ছিলেন কি না? যদি নবী থেকে থাকেন তাহলে কুরআন থেকে কি আমরা পয়গম্বরীর এ ধারণা লাভ করি যে, ইসলামের আহবায়ক নিজেই কুফরী ব্যবস্থাকে কাফেরী পদ্ধতিতে পরিচালনা করার জন্য নিজের শক্তি ও যোগ্যতা পেশ করছেন? বরং এ প্রশ্ন শুধু এখানেই শেষ হয়ে যায় না, এর চেয়েও আরো অনেক বেশী কঠিন ও নাজুক অন্য একটি প্রশ্নেরও জন্ম দেয়। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ একজন সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন কি না? যদি সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে থেকে থাকেন তাহলে একজন সত্যবাদী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কি এ ধরনের কাজ করে থাকেন যে, কারাগারে অবস্থানকালে এ প্রশ্নের মাধ্যমে তাঁর নবুওয়াতের দাওয়াতের সূচনা করেন : "অনেক প্রভু ভালো অথবা একজন আল্লাহ তিনি সবার ওপর বিজয়ী" এবং বারংবার মিসরবাসীদের কাছে একথা সুস্পষ্ট করে দেন যে, মিসরের বাদশাহও তোমাদের এসব বিভিন্ন মনগড়া প্রভুদের একজন আর এ সংগে পরিষ্কারভাবে নিজের মিশনের এ মৌলিক বিশ্বাসটিও বর্ণনা করে দেন যে, "শাসন কর্তৃত্বের অধিকার এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই।" কিন্তু যখন বাস্তব পরীক্ষার সময় আসে তখন এ ব্যক্তিই আবার হয়ে যান মিসরের বাদশাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার খাদেম বরং ব্যবস্থাপক, সংরক্ষক ও পৃষ্ঠপোশক, যার মৌলিক আদর্শই ছিল, "শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহর জন্য নয়, বাদশাহর জন্য নির্ধারিত?"

আসলে এ অংশের ব্যাখ্যায় পতন যুগের মুসলমানরা অনেকটা তেমনি ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন যা এক সময় ইহুদিদের বৈশিষ্ট ছিল। ইহুদীদের অবস্থা ছিল এই যে, অতীত ইতিহাসের যেসব মনীষীর জীবন ও চরিত্র তাদেরকে উন্নতির শিখরে আরোহণে উদ্বুদ্ধ করতো, নিজেদের নৈতিক ও মানসিক পতনের যুগে তারা তাদের সবাইকে নিচে নামিয়ে নিজেদের সমপর্যায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এভাবে তারা নিজেদের জন্য আরো বেশি নিচে নেমে যাবার বাহানা সৃষ্টি করে নিয়েছিল। দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানরাও একই ধরনের আচরণ করেছে। তাদের কাফের সরকারের চাকরি করার

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۗ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

এভাবে আমি পৃথিবীতে ইউসুফের জন্য কর্তৃত্বের পথ পরিষ্কার করেছি। সেখানে সে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারতো।[৪৮] আমি যাকে ইচ্ছা নিজের রহমতে অভিষিক্ত করি। সৎকর্মশীল লোকদের প্রতিদান আমি নষ্ট করি না। আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া সহকারে কাজ করতে থেকেছে আখেরাতের প্রতিদান তাদের জন্য আরো ভালো।[৪৯]

প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এভাবে নিচে নামতে গিয়ে ইসলাম ও তার পতাকাবাহীদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব দেখে তারা লজ্জা পেলো। তাই এ লজ্জা দূর করার এবং নিজেদের বিবেককে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা নিজেদের সাথে এমন মহান মর্যাদাশালী পয়গম্বরকেও কুফরের সেবা করার পংকে নামিয়ে আনলো, যাঁর জীবন তাদেরকে এ শিক্ষা দিচ্ছিল যে, কোন দেশে যদি শুধুমাত্র একজন মর্দে মুমিনও নির্ভেজাল ইসলামী চরিত্র এবং ঈমানী বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার অধিকারী থেকে থাকে, তাহলে সে একাকীই কেবলমাত্র নিজের চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তার জোরে সে দেশে ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। আর মর্দে মুমিনের চারিত্রিক শক্তি (শর্ত হচ্ছে, সে যেন তা ব্যবহার করতে জানে এবং ব্যবহার করার ইচ্ছাও রাখে) সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াই দেশ জয় করতে পারে এবং রাষ্ট্র ও সরকারের ওপর বিজয় লাভ করে।

৪৮. অর্থাৎ এখন সমগ্র মিসর দেশ ছিল তার অধিকারভুক্ত। এ দেশের যে কোন জায়গায় তিনি নিজের আবাস গড়ে তুলতে পারতেন। এ দেশের কোন জায়গায় বসতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারো ছিল না। এ দেশের ওপর হযরত ইউসুফের যে পূর্ণাংগ কর্তৃত্ব অধিকার ছিল এ যেন ছিল তার বর্ণনা। প্রথম যুগের মুফাস্‌সিরগণ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে যায়েদের বরাত দিয়ে আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী তাঁর নিজের তাফসীর গ্রন্থে এর এই অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, "আমি ইউসুফকে মিসরে যা কিছু ছিল সব জিনিসের মালিক বানিয়ে দিলাম। দুনিয়ার সেই এলাকার যেখানেই সে যা কিছু চাইতো করতে পারতো। সেই দেশটির সমগ্র এলাকা তার হাতে সোপর্দ করে দেয়া হয়েছিল। এমনকি সে যদি ফেরাউনকে নিজের অধীনস্থ করে তার ওপর কর্তৃত্ব করতে চাইতো তাহলে তাও করতে পারতো।" আল্লামা তাবারী দ্বিতীয় একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, সেটি মুজাহিদের উক্তি। মুজাহিদ হচ্ছেন তাফসীর শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম। তাঁর মতে মিসরের বাদশাহ হযরত ইউসুফের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

وَجَاۤءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْۤ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٥٩﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَاۤ اِذَا انْقَلَبُوْۤا اِلٰۤى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾

৮ রুকূ'

ইউসুফের ভাইয়েরা মিসরে এলো এবং তার কাছে হাযির হলো।[৫০] সে তাদেরকে চিনে ফেললো। কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারলো না।[৫১] তারপর সে যখন তাদের জিনিসপত্র তৈরী করালো তখন চলার সময় তাদেরকে বললো, "তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে আমাদের কাছে আনবে, দেখছো না আমি কেমন পরিমাপ পাত্র ভরে দেই এবং আমি কেমন ভালো অতিথিপরায়ণ? যদি তোমরা তাকে না আনো তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য কোন শস্য নেই বরং তোমরা আমার ধারেকাছেও এসো না"।[৫২] তারা বললো, "আমরা চেষ্টা করবো যাতে আব্বাজান তাকে পাঠাতে রাযী হয়ে যান এবং আমরা নিশ্চয়ই এমনটি করবো।" ইউসুফ নিজের গোলামদেরকে ইশারা করে বললো, "ওরা শস্যের বিনিময়ে যে অর্থ দিয়েছে তা চুপিসারে ওদের জিনিসপত্রের মধ্যেই রেখে দাও।" ইউসুফ এটা করলো এ আশায় যে, বাড়িতে পৌঁছে তারা নিজেদের ফেরত পাওয়া অর্থ চিনতে পারবে (অথবা এ দানশীলতার ফলে তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হবে) এবং বিচিত্র নয় যে, তারা আবার ফিরে আসবে।

৪৯. এখানে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যেন পার্থিব রাষ্ট্র–ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করাকে সততা ও সৎকর্মশীলতার প্রকৃত পুরস্কার ও যথার্থ কাংখিত প্রতিদান মনে না করে বসে। বরং তাকে জেনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ আখেরাতে যে পুরস্কার দেবেন সেটিই সর্বোত্তম প্রতিদান এবং সেই প্রতিদানটিই মুমিনের কাংখিত হওয়া উচিত।

৫০. এখানে আবার সাত আট বছরের ঘটনা মাঝখানে বাদ দিয়ে বর্ণনার ধারাবাহিকতা এমন এক জায়গা থেকে শুরু করে দেয়া হয়েছে যেখান থেকে বনী ইসরাঈলের মিসরে

স্থানান্তরিত হবার এবং হযরত ইয়াকূবের (আ) হারানো ছেলের সন্ধান পাওয়ার সূত্রপাত হয়। মাঝখানে যেসব ঘটনা বাদ দেয়া হয়েছে সেগুলোর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, হযরত ইউসুফের (আ) রাজত্বের প্রথম সাত বছর মিসরে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এ সময় তিনি আসন্ন দুর্ভিক্ষের মোকাবিলা করার জন্য পূর্বাহ্নে এমন সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন যার পরামর্শ তিনি স্বপ্নের তা'বীর বলার সময় বাদশাহকে দিয়েছিলেন। এরপর শুরু হয় দুর্ভিক্ষের যামানা। এ দুর্ভিক্ষ শুধু মিসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আশেপাশের দেশগুলোতেও দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সিরিয়া, ফিলিস্তিন, পূর্ব জর্দান, দক্ষিণ আরব সব জায়গায় চলে দুর্ভিক্ষের অবাধ বিচরণ। এ অবস্থায় হযরত ইউসুফের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনার কারণে একমাত্র মিসরে দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য থাকে। কাজেই প্রতিবেশী দেশগুলোর লোকেরা খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য মিসরে আসতে বাধ্য হয়। এ সময় ফিলিস্তিন থেকে হযরত ইউসুফের (আ) ভাইয়েরা খাদ্যশস্য কেনার জন্য মিসরে পৌঁছে। সম্ভবত হযরত ইউসুফ (আ) খাদ্য ব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তোলেন যার ফলে বাইরের দেশগুলোয় বিশেষ অনুমতিপত্র ছাড়া এবং বিশেষ পরিমাণের বেশী খাদ্য সরবরাহ করা যেতে পারতো না। এ কারণে ইউসুফের ভাইয়েরা যখন বহির্দেশ থেকে এসে খাদ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিল তখন সম্ভবত তাদের বিশেষ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করার প্রয়োজন হয়েছিল এবং এভাবেই তাদের হযরত ইউসুফের সামনে হাযির হতে হয়েছিল।

৫১. ইউসুফের ভাইয়েরা যে ইউসুফকে চিনতে পারেনি এটা কোন অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। যে সময় তারা তাঁকে কূয়ায় ফেলে দিয়েছিল তখন তিনি ছিলেন সতের বছর বয়সের একটি কিশোর মাত্র। আর এখন তাঁর বয়স আটতিরিশ বছরের কাছাকাছি। এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের চেহারার কাঠামোয় অনেক পরিবর্তন আসে। তাছাড়া যে ভাইকে তারা কূয়ায় ফেলে দিয়েছিল সে আজ মিসরের অধিপতি হবে, একথা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

৫২. বর্ণনা সংক্ষেপের কারণে হয়তো কারো পক্ষে একথা অনুধাবন করা কঠিন হয়ে পড়ছে যে, হযরত ইউসুফ যখন নিজের ব্যক্তিত্বকে তাদের সামনে প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন না তখন আবার তাদের বৈমাত্রেয় ভাইয়ের কথা এলো কেমন করে? এবং তাকে আনার ব্যাপারে তাঁর এত বেশী পীড়াপীড়ি করারই বা অর্থ কি? কেননা, এভাবে তো রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলে একথা পরিষ্কার বুঝা যায়। সেখানে খাদ্যশস্যের নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ছিল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে পারতো। শস্য নেবার জন্য তারা দশ ভাই এসেছিল। কিন্তু তারা তাদের পিতার ও একাদশতম ভাইয়ের অংশও হয়তো চেয়েছিল। একথায় হযরত ইউসুফ (আ) বলে থাকবেন, বুঝলাম তোমাদের পিতার না আসার জন্য যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং তার ওপর চোখে দেখতে পান না, ফলে তাঁর পক্ষে সশরীরে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু ভাইয়ের না আসার কি ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকতে পারে? এমন তো নয় যে, একজন বানোয়াট ভাইয়ের নাম করে অতিরিক্ত শস্য সংগ্রহ করে তোমরা অবৈধ ব্যবসায়ে নামার চেষ্টা করছো? জওয়াবে তারা হয়তো নিজেদের গৃহের অবস্থা বর্ণনা করেছে। তারা বলে থাকবে, সে আমাদের বৈমাত্রেয় ভাই। কিছু অসুবিধার কারণে পিতা তাকে আমাদের সাথে পাঠাতে ইতস্তত করেন। তাদের এসব কথায় হযরত

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا
أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا
أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ
الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ
قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا
وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ
لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن
يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

যখন তারা তাদের বাপের কাছে ফিরে গেলো তখন বললো, "আব্বাজান। আগামীতে আমাদের শস্য দিতে অস্বীকার করা হয়েছে, কাজেই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা শস্য নিয়ে আসতে পারি এবং অবশ্যি আমরা হেফাজতের জন্য দায়ী থাকবো।" বাপ জবাব দিল, "আমি কি ওর ব্যাপারে তোমাদের ওপর ঠিক তেমনি ভরসা করবো যেমন ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে করেছিলাম? অবশ্য আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হেফাজতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশী করুণাশীল।" তারপর যখন তারা নিজেদের জিনিসপত্র খুললো, তারা দেখলো তাদের অর্থও তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। এ দৃশ্য দেখে তারা চিৎকার করে উঠলো, "আব্বাজান, আমাদের আর কী চাই! দেখুন এই আমাদের অর্থও আমাদের ফেরত দেয়া হয়েছে। ব্যস্‌ এবার আমরা যাবো আর নিজেদের পরিজনদের জন্য রসদ নিয়ে আসবো, নিজেদের ভাইয়ের হেফাজতও করবো এবং অতিরিক্ত একটি উট বোঝাই করে শস্যও আনবো, এ পরিমাণ শস্য বৃদ্ধি অতি সহজেই হয়ে যাবে।" তাদের বাপ বললো, "আমি কখনোই তাকে তোমাদের সাথে পাঠাবো না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে আমার কাছে অংগীকার করবে। এ মর্মে যে তাকে নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তবে হাঁ যদি কোথাও তোমরা ঘেরাও হয়ে যাও তাহলে ভিন্ন কথা।" যখন তারা তার কাছে অংগীকার করলো তখন সে বললো, "দেখো, আল্লাহ আমাদের একথার রক্ষক।"

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

তারপর সে বললো, "হে আমার সন্তানরা! মিসরের রাজধানীতে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না বরং বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো।[৫৩] কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি না। তাঁর ছাড়া আর কারোর হুকুম চলে না, তাঁর ওপরই আমি ভরসা করি এবং যার ভরসা করতে হয় তাঁর ওপরই করতে হবে।" আর ঘটনাক্ষেত্রে তা-ই হলো, যখন তারা নিজেদের বাপের নির্দেশ মতো শহরে (বিভিন্ন দরজা দিয়ে) প্রবেশ করল তখন তার এ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আল্লাহর ইচ্ছার মোকাবিলায় কোন কাজে লাগলো না। তবে হাঁ, ইয়াকূবের মনে যে একটি খটকা ছিল তা দূর করার জন্য সে নিজের মনমতো চেষ্টা করে নিল। অবশ্যি সে আমার দেয়া শিক্ষায় জ্ঞানবান ছিল কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রকৃত সত্য জানে না।[৫৪]

ইউসুফ সম্ভবত বলেছেন, যাক এবারের জন্য তো আমি তোমাদের কথা বিশ্বাস করে পূর্ণ শস্য দিয়ে দিলাম কিন্তু আগামীতে তোমরা যদি তাকে সংগে করে না আনো তাহলে তোমাদের ওপর থেকে আস্থা উঠে যাবে এবং এখান থেকে তোমরা আর কোন শস্য পাবে না। এ শাসক সুলভ হুমকি দেবার সাথে সাথে তিনি নিজের দাক্ষি[illegible] ও মেহমানদারীর মাধ্যমে তাদেরকে বশীভূত করার চেষ্টা করেন। কারণ নিজের ছোট ভাইকে দেখার এবং ঘরের অবস্থা জানার জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে পড়েছিল। এটি ছিল ঘটনার একটি সাদামাটা চেহারা। সামান্য একটু চিন্তা-ভাবনা করলে ব্যাপারটি আপনাআপনিই বুঝতে পারা যায়। এ অবস্থায় বাইবেলের আদি পুস্তকের ৪২-৪৩ অধ্যায়ে নানা প্রকার রং চড়িয়ে যে অতিরঞ্জিত কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে তার ওপর আস্থা স্থাপন করার কোন প্রয়োজন নেই।

৫৩. এ থেকে অনুমান করা যায়, ইউসুফের পরে তার ভাইকে পাঠাবার সময় হযরত ইয়াকূবের মন কত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। যদিও আল্লাহর প্রতি আস্থা ছিল এবং সবর

ও আত্মসমর্পণের দিক দিয়েও তাঁর স্থান ছিল অনেক উঁচুতে তবুও তো তিনি মানুষই ছিলেন। নানা সন্দেহ ও আশংকা তাঁর মনে জেগে ওঠা বিচিত্র নয় এবং স্বতই এ চিন্তায় তিনি পেরেশান হয়ে গিয়ে থাকবেন যে, আল্লাহই ভালো জানেন এখন এ ছেলের চেহারাও আর দেখতে পাবো কি না! তাই তিনি হয়তো নিজের সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার ত্রুটি না রাখতে চেয়েছিলেন।

সে সময় যে রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজিত ছিল তার কথা চিন্তা করলেই এক দরজা দিয়ে সকল ভাইয়ের মিসরের রাজধানীতে প্রবেশ না করার এ সতর্কতামূলক পরামর্শটির তাৎপর্য পরিষ্কার বুঝা যেতে পারে। তারা ছিল মিসর সীমান্তের স্বাধীন উপজাতীয় এলাকার বাসিন্দা। বিচিত্র নয় যে, মিসরবাসীরা এ এলাকার লোকদেরকে ঠিক তেমনি সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতো যেমন বৃটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসকরা সীমান্ত এলাকার স্বাধীন অধিবাসীদেরকে দেখে এসেছে। হযরত ইয়াকূবের মনে আশংকা জেগে থাকবে, এ দুর্ভিক্ষের দিনে যদি তারা দলবদ্ধ হয়ে সেখানে প্রবেশ করে তাহলে হয়তো তাদেরকে সন্দেহভাজন মনে করা হবে এবং ধারণা করা হবে, তারা এখানে লুটপাট করতে এসেছে। আগের আয়াতে হযরত ইয়াকূবের "তবে যদি তোমাদের ঘেরাও করা হয়" এ উক্তিটি নিজেই এ বিষয়বস্তুর দিকে ইংগিত করছে যে, রাজনৈতিক কারণে এ পরামর্শটি দেয়া হয়েছিল।

৫৪. এর অর্থ হচ্ছে, কৌশল ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীলতার মধ্যে এ যথাযথ ভারসাম্য স্থাপন, যা তোমরা ইয়াকুব আলাইহিস সালামের উপরোল্লিখিত উক্তির মধ্যে পাও। আসলে আল্লাহর অনুগ্রহে তার সত্যজ্ঞানের যে ধারা বর্ষিত হয়েছিল এ ছিল তারই ফলশ্রুতি। একদিকে উপায় উপকরণের স্বাভাবিক বাধ্যবাধকতার বিধান অনুযায়ী তিনি এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, যা বুদ্ধি, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অবলম্বন করা সম্ভব ছিল। ছেলেদেরকে তাদের প্রথম অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভয় দেখান ও সাবধান করে দেন, যাতে তারা পুনর্বার ঐ ধরনের অপরাধ করার সাহস না করে। তাদের কাছ থেকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের হেফাজত করার জন্য আল্লাহর নামে শপথ নেন এবং তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন অনুভূত হয় তা অবলম্বন করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেন, যাতে নিজেদের সাধ্যমত ব্যবস্থাপনার মধ্যে এমন কোন ত্রুটি থাকতে না দেয়া হয় যার ফলে তারা ঘেরাও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে প্রতি মূহূর্তে একথা তাঁর সামনে আছে এবং তিনি বারবার একথা প্রকাশও করেন যে, আল্লাহর ইচ্ছা প্রয়োগের পথে কোন মানবীয় কৌশল বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহর হেফাজতই আসল হেফাজত এবং নিজের কৌশল ও ব্যবস্থাপনার ওপর ভরসা না করে আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর ভরসা করা উচিত। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যের জ্ঞান রাখে, যে ব্যক্তি একথাও জানে যে, দুনিয়ার জীবনের বাইরের দিকে আল্লাহর তৈরী প্রাকৃতিক ব্যবস্থা কোন্ ধরনের প্রচেষ্টা ও কাজ দাবী করে এবং একথাও জানে যে, এ বাহ্যিক দিকের পেছনে যে প্রকৃত সত্য লুকিয়ে আছে তার ভিত্তিতে আসল কার্যকর শক্তি কি এবং তার উপস্থিতিতে নিজের প্রচেষ্টা ও কাজের ওপর মানুষের ভরসা কত বেশী ভিত্তিহীন—একমাত্র সে-ই নিজের কথা ও কাজের মধ্যে এ সঠিক ভারসাম্য কায়েম করতে পারে। একথাটিই অধিকাংশ লোক জানে না। তাদের মধ্য

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾

৯ রুকূ'

তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছলে সে তার সহোদর ভাইকে নিজের কাছে আলাদা করে ডেকে নিল এবং তাকে বললো, "আমি তোমার সেই (হারানো) ভাই, এখন আর সেসব আচরণের জন্য দুঃখ করো না যা এরা করে এসেছে।"৫৫

যখন ইউসুফ তাদের মালপত্র বোঝাই করাতে লাগলো তখন নিজের ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে নিজের পেয়ালা রেখে দিল।৫৬ তারপর একজন নকীব চীৎকার করে বললো, "হে যাত্রীদল! তোমরা চোর।"৫৭ তারা পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "তোমাদের কি হারিয়ে গেছে?" সরকারী কর্মচারী বললো, "আমরা বাদশাহর পানপাত্র পাচ্ছি না," (এবং তাদের জমাদার বললো ঃ) "যে ব্যক্তি তা এনে দেবে তার জন্য রয়েছে পুরস্কার এক উট বোঝাই মাল। আমি এর দায়িত্ব নিচ্ছি।" এ ভাইয়েরা বললো, "আল্লাহর কসম। তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো, আমরা এ দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি এবং চুরি করার মতো লোক আমারা নই।" তারা বললো, "আচ্ছা, যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে চোরের কি শাস্তি হবে?"

থেকে যাদের ওপর বাহ্যিক দিকের প্রভাব বেশী পড়ে তারা আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা থেকে গাফেল হয়ে কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বনকে সবকিছু মনে করে বসে এবং অন্তরনিহিত সত্য যার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে সে জাগতিক কৌশল ও ব্যবস্থা অবলম্বন না করে শুধু মাত্র আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার ভিত্তিতে জীবনের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

৫৫. একুশ বাইশ বছরের ব্যবধানে দু'ভাইয়ের পুনরমিলনের পর যে অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকবে এ বাক্যে তার সম্পূর্ণ চেহারাটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ)

قَالُوا جَزَآؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَآؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

তারা জবাব দিল, "তার শাস্তি" যার মালপত্রের মধ্যে ঐ জিনিস পাওয়া যাবে তার শাস্তি হিসেবে তাকেই রেখে দেয়া হবে। আমাদের এখানে তো এটাই এ ধরনের জালেমদের শাস্তির পদ্ধতি।"৫৮

নিজের অবস্থা বর্ণনা করে কোন্ কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি আজকের এ মর্যাদায় পৌছেছেন তা বলে থাকবেন। বিন ইয়ামীন বর্ণনা করে থাকবেন তাঁর অন্তরধানের পর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তার সাথে কেমনতর দুর্ব্যবহার করেছে। হযরত ইউসুফ (আ) ভাইকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে থাকবেন, এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকবে, এ জালেমদের খপ্পরে তোমাকে আর দ্বিতীয়বার পড়তে দেবো না। সম্ভবত এ সময়ই বিন ইয়ামীনকে মিসরে আটকে রাখার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে এবং প্রয়োজনের খাতিরে এখন তা গোপন রাখতে হবে এ ব্যাপারে আলোচনার পর দু'ভাই একটি সিদ্ধান্তে পৌছে যান।

৫৬. সম্ভবত পেয়ালা রেখে দেবার কাজটা হযরত ইউসুফ (আ) নিজের ভাইয়ের সম্মতি নিয়ে তার জ্ঞাতসারেই করেছিলেন। আগের আয়াতে এ দিকে ইংগিত করা হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ) দীর্ঘকালীন বিচ্ছেদের পর জালেম বৈমাত্রেয় ভাইদের হাত থেকে নিজের সহোদর ভাইকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। ভাই নিজেও এ জালেমদের সাথে ফিরে না যেতে চেয়ে থাকবেন। কিন্তু হযরত ইউসুফের নিজের পরিচয় প্রকাশ না করে তাকে প্রকাশ্যে আটকে রাখা এবং তার মিসরে থেকে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আর এ অবস্থায় এ পরিচয় প্রকাশ করাটা কল্যাণকর ছিল না। তাই বিন ইয়ামীনকে আটকে রাখার জন্য দু'ভাইয়ের মধ্যে এ পরামর্শ হয়ে থাকবে। যদিও এর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য ভাইয়ের অপমান অনিবার্য ছিল, কারণ তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হচ্ছিল, কিন্তু পরে উভয় ভাই মিলে আসল ব্যাপারটি জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিলেই এ কলংকের দাগ অতি সহজেই মুছে ফেলা যেতে পারবে।

৫৭. এ আয়াতে এবং পরবর্তী আয়াতগুলোতে কোথাও এ ধরনের কোন ইশারা পাওয়া যায় না, যা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ) নিজের কর্মচারীদেরকে এ গোপন ব্যাপারটি পূর্বাহ্নে অবহিত করেছিলেন এবং তাদেরকে যাত্রীদলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনার ব্যাপারটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনার যে সরল আকৃতিটি সহজেই চোখে ধরা পড়ে তা হচ্ছে এই যে, পেয়ালাটি হয়তো নীরবে রেখে দেয়া হয়েছিল, পরে সরকারী কর্মচারীরা সেটি খুঁজে না পেলে অনুমান করা হয়েছিল, এটা নিশ্চয় সেই কাফেলার অন্তরভুক্ত কোন লোকের কাজ যারা এখানে অবস্থান করেছিল।

৫৮. উল্লেখ্য, এ ভাইয়েরা ছিল ইবরাহিমী পরিবারের সন্তান। কাজেই চুরির ব্যাপারে তারা যে আইনের কথা বলে তা ছিল ইবরাহিমী শরীয়াতের আইন। এ আইন অনুযায়ী চোরের শাস্তি ছিল, যে ব্যক্তির সম্পদ সে চুরি করেছে তাকে তার দাসত্ব করতে হবে।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاۤءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿٧٦﴾

তখন ইউসুফ নিজের ভাইয়ের আগে তাদের থলের তল্লাশী শুরু করে দিল। তারপর নিজের ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে হারানো জিনিস বের করে ফেললো।—এভাবে আমি নিজের কৌশলের মাধ্যমে ইউসুফকে সহায়তা করলাম।[৫৯] বাদশাহর দীন (অর্থাৎ মিসরের বাদশাহর আইন) অনুযায়ী নিজের ভাইকে পাকড়াও করা তার পক্ষে সংগত ছিল না, তবে যদি আল্লাহই এমনটি চান।[৬০] যাকে চাই তার মর্তবা আমি বুলন্দ করে দেই। আর একজন জ্ঞানবান এমন আছে যে প্রত্যেক জ্ঞানবানের চেয়ে জ্ঞানী।

৫৯. এ সমগ্র ধারাবাহিক ঘটনাবলীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফের সমর্থনে সরাসরি কোন্ কৌশলটি অবলম্বন করা হয়েছিল তা অবশ্যি এখানে ভেবে দেখার মতো বিষয়। একথা সুস্পষ্ট যে, পেয়ালা রাখার কৌশলটি হযরত ইউসুফ নিজেই করেছিলেন। এটাও সুস্পষ্ট, সরকারী কর্মচারীদের চুরির সন্দেহে কাফেলাকে আটকানোও একটি নিয়ম মাফিক কাজ ছিল, যা এ ধরনের অবস্থায় সব সরকারী কর্মচারীই করে থাকে। তাহলে আল্লাহর সেই কৌশল কোনটি? ওপরের আয়াতের মধ্যে অনুসন্ধান চালালে এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন জিনিসই এর ক্ষেত্রহিসেবে পাওয়া যেতে পারে না যে, সরকারী কর্মচারীরা নিয়ম বিরোধীভাবে নিজেরাই সন্দেহপূর্ণ অপরাধীদের কাছে চুরির শাস্তি জিজ্ঞেস করলো এবং জবাবে তারাও এমন শাস্তির কথা বললো যা ইবরাহিমী শরীয়াতের দৃষ্টিতে চোরকে দেয়া হতো। এর ফলে দু'টি লাভ হলো। প্রথমত হযরত ইউসুফ ইবরাহিমী শরীয়াতকে কার্যকর করার সুযোগ পেলেন এবং দ্বিতীয়ত নিজের ভাইকে হাজতে পাঠাবার পরিবর্তে তিনি নিজের কাছে রাখতে পারলেন।

৬০. অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) নিজের একটি ব্যক্তিগত ব্যাপারে মিসরের বাদশাহর আইন কার্যকর করবেন, এটা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না। ভাইকে আটকে রাখার জন্য তিনি নিজে যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর জন্য একটি বাধা থেকে গিয়েছিল। অর্থাৎ তিনি ভাইকে আটক করতে পারতেন ঠিকই কিন্তু এ জন্য তাঁকে মিসরের বাদশাহর অপরাধ দণ্ডবিধির আশ্রয় নিতে হতো। আর এটি ছিল তাঁর পয়গম্বরীর মর্যাদা বিরোধী। কারণ তিনি ইসলাম বিরোধী আইনের জায়গায় ইসলামী শরীয়াতের আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যেই দেশের শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন। আল্লাহ চাইলে তাঁর নবীকে এ ধরনের একটি বেমানান ভুলের অবতারণা

করতে দিতে পারতেন। কিন্তু এ কলংক কালিমা তাঁর গায়ে লেগে থাকুক এটা তিনি চাননি। তাই তিনি সরাসরি নিজ ব্যবস্থাপনায় একটি পথ বের করে দিলেন। ঘটনাক্রমে ইউসুফের ভাইদের কাছে চোরের শাস্তি কি হতে পারে তা জিজ্ঞেস করা হলো এবং তারা এ জন্য ইবরাহিমী শরীয়াতের আইন বর্ণনা করলো। ইউসুফের ভাইয়েরা মিসরের নাগরিক না হওয়ার কারণে এ জিনিসটি এদিক দিয়ে একেবারেই যথাযথ ছিল। তারা এসেছিল একটি স্বাধীন এলাকা থেকে। কাজেই তারা যদি তাদের এলাকায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের লোককে এমন এক ব্যক্তির দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করতে রাযী থাকে যার সম্পদ সে চুরি করেছে তাহলে এ ক্ষেত্রে আর মিসরীয় দণ্ডবিধির সাহায্য নেবার প্রয়োজনই থাকে না। পরবর্তী দু'টি আয়াতে আল্লাহ এ জিনিসটিকেই নিজের অনুগ্রহ ও তাত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি যখন তার মানবিক দুর্বলতার কারণে নিজে কোন পদস্খলনের শিকার হয় তখন আল্লাহ অদৃশ্য থেকে তাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন, তার জন্য এর চেয়ে বড় মর্যাদা আর কি হতে পারে! এ ধরনের উন্নত মর্যাদা একমাত্র তারাই লাভ করতে পারেন যারা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমে বড় বড় পরীক্ষায় নিজেদের 'মুহসিন' তথা সৎকর্মশীল হওয়া প্রমাণ করে দিয়েছেন। যদিও হযরত ইউসুফ (আ) তাত্বিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, নিজে প্রখর প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে কাজ করতেন, তবুও এ সময় তাঁর জ্ঞানের মধ্যে একটি ফাঁক থেকে গিয়েছিল এবং এমন এক সত্তা এ ফাঁক পূরণ করেছিলেন যিনি সবার চেয়ে বড় জ্ঞানী।

এখানে আরো কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ থেকে যায়। সেগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

এক ঃ সাধারণভাবে এ আয়াতটির অনুবাদ এভাবে করা হয়ে থাকে ঃ "বাদশাহর আইন মোতাবিক ইউসুফ নিজের ভাইকে পাকড়াও করতে পারতো না।" অর্থাৎ ما كان ليأخذ কে অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতাগণ অক্ষমতা অর্থে নিয়েছেন, অন্যায় বা অসংগত অর্থে নেননি। কিন্তু প্রথমত এ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আরবী বাকধারা ও কুরআনিক ব্যবহার উভয় দিক দিয়েই ঠিক নয়। কেননা আরবীতে সাধারণত ما كان له শব্দ ব্যবহৃত হয় ما ينبغى له ما صح له ، ما استقام له ইত্যাদি অর্থে। আর কুরআনেও এটি বেশীর ভাগ এ অর্থেই এসেছে। যেমন–

مَا كَانَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ – مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ – مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ – مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ – فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ – مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ – مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا –

দ্বিতীয়ত অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতাগণ সাধারণভাবে যে অর্থ বর্ণনা করেন যদি এর সে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে ব্যাপারটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। বাদশাহর আইনে চোরকে পাকড়াও

করতে না পারার কি কারণ হতে পারে? দুনিয়ায় কি কখনো এমন পর্যায়েরও কোন রাষ্ট্র ছিল যার আইন চোরকে গ্রেফতার করার অনুমতি দিত না?

দুই ঃ রাজকীয় আইনের জন্য আল্লাহ دين الملك (বাদশাহর আইন) শব্দ ব্যবহার করে নিজেই ما كان ليأخذ থেকে যে অর্থ গ্রহণ করা উচিত সেদিকে ইংগিত করেছেন। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর নবীকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল دين الله (আল্লাহর আইন) জারী কার জন্য, دين الملك (বাদশাহর আইন) জারী করার জন্য নয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনিবার্যতার কারণে যদি সেই রাষ্ট্রে সেই সময় পর্যন্ত বাদশাহর আইনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন পুরোপুরি জারি করা সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে অন্ততপক্ষে নিজের একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে বাদশাহর আইন কার্যকর করাতো নবীর পক্ষে সমিচীন ছিল না। কাজেই হযরত ইউসুফের (আ) বাদশাহর আইন অনুযায়ী নিজের ভাইকে গ্রেফতার না করার কারণ এটা ছিল না যে, বাদশাহর আইনে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের অবকাশ ছিল না বরং এর কারণ শুধু এটিই ছিল যে, নবী হিসেবে অন্ততপক্ষে নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে আল্লাহর আইন কার্যকর করা তাঁর জন্য ফরয ছিল। এ ক্ষেত্রে বাদশাহর আইন অনুযায়ী কাজ করা তাঁর জন্য কোনক্রমেই সংগত ছিল না।

তিন ঃ দেশীয় আইনের (Law of the land) জন্য "দীন" শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর দীনের অর্থের ব্যাপকতা পুরোপুরি প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ থেকে "দীন" সম্পর্কে এক ধরনের লোকদের ধারণার মূল উৎপাটিত হয়ে গেছে। তারা ধারণা করেন, নবীগণের দাওয়াত শুধুমাত্র সাধারণ ধর্মীয় অর্থে এক আল্লাহর পূজা উপাসনা-আরাধনা করা এবং নিছক কতিপয় ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ মেনে চলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তারা এও মনে করেন, মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-আদালত এবং এ ধরনের অন্যান্য পার্থিব বিষয়াদির সাথে দীনের কোন সম্পর্ক নেই। অথবা যদি সম্পর্ক থাকে তাহলে উল্লেখিত বিষয়াদি সম্পর্কে দীনের নির্দেশাবলী নিছক ঐচ্ছিক সুপারিশের পর্যায়ভুক্ত। এগুলো কার্যকর করতে পারলে ভালো, অন্যথায় মানুষের নিজের হাতে গড়া বিধান মেনে চলায় কোন ক্ষতি নেই। এটি পুরোপুরি দীন সম্পর্কে একটি বিভ্রান্ত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। দীর্ঘদিন থেকে মুসলমানদের মধ্যে এর অনুশীলন চলছে। মুসলমানদেরকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম থেকে গাফেল করে দেবার ক্ষত্রে এটিই বেশীরভাগ দায়ী। এরি বদৌলতে মুসলমানরা কুফরী ও জাহেলী জীবন ব্যবস্থায় কেবল সন্তুষ্টই হয়নি বরং একজন নবীর সুন্নাত মনে করে এ ব্যবস্থার কল-কব্জায় পরিণত হতে এবং নিজেরাই তাকে পরিচালিত করতেও উদ্যোগী হয়েছে। এ আয়াতের দৃষ্টিতে এ চিন্তা ও কর্মনীতি পুরোপুরি ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। এখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পরিষ্কার ভাষায় বলছেন ঃ যেভাবে নামায, রোযা ও হজ্জ দীনের অন্তরভুক্ত ঠিক তেমনি যে আইনের ভিত্তিতে দেশ ও সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় তাও দীনের অন্তরভুক্ত। কাজেই إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ এবং وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ইত্যাদি আয়াতগুলোতে যে দীনের প্রতি আনুগত্যের দাবী জানানো হয়েছে তার অর্থ শুধু নামায-রোযাই নয় বরং ইসলামের সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাও তার আওতায় এসে যায়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর মনোনীত এ ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য পরিহার করে অন্য কোন ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য করা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

চার ঃ প্রশ্ন করা যেতে পারে, অন্ততপক্ষে এতটুকুন তো প্রমাণিত যে, এ সময় পর্যন্ত মিসরে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে "বাদশাহর দীন"–ই জারী ছিল। যদি এ সরকারের প্রধান শাসনকর্তা হযরত ইউসুফই হয়ে থাকেন যেমন এর আগে আপনি প্রমাণ করেছেন, তাহলে তো দেখা যায় আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ নিজেই নিজের হাতে "বাদশাহর দীন" জারী করছিলেন। এরপর হযরত ইউসুফ যদি নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে "বাদশাহর দীন"–এর পরিবর্তে ইবরাহীমের শরীয়াতকে কার্যকর করেন তাহলে তাতেই বা কি পার্থক্য হয়? এর জবাব হচ্ছে, হযরত ইউসুফ তো আল্লাহর দীন জারী করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। এটিই ছিল তাঁর নবুওয়াতী মিশন এবং তাঁর শাসনের উদ্দেশ্য। কিন্তু একটি দেশের ব্যবস্থা কার্যত এক দিনেই বদলে দেয়া যায় না। আজ যদি কোন দেশ সম্পূর্ণভাবে আমাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং আমরা সেখানে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক সংকল্প সহকারে তার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা নিজেদের হাতে নেই, তাহলেও তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং আইন ও আদালত ব্যবস্থা বাস্তবে পরিবর্তিত করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। এ অবস্থায় কিছুকাল পর্যন্ত আমাদের ব্যবস্থাপনায়ও পূর্বের আইন বহাল রাখতে হবে। ইতিহাস কি একথার সাক্ষ দেয় না যে, আরবের জীবন ব্যবস্থায় পূর্ণ ইসলামী বিপ্লব সাধনের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নয়–দশ বছর সময় লেগেছিল? এ সময় শেষ নবীর নিজের রাষ্ট্রেই কয়েক বছর মদ পান চলতে থাকে। সূদের লেন–দেন জারী থাকে। জাহেলী যুগের মীরাসী আইন জারী থাকে। পুরাতন বিয়ে–তালাকের আইন চালু থাকে। অনেক ধরনের অবৈধ ব্যবসায় কার্যকর হতে থাকে। প্রথম দিনেই ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন পুরোপুরি ও সর্বতোভাবে প্রবর্তিত হয়নি। কাজেই হযরত ইউসুফের রাষ্ট্রে যদি প্রথম আট–নয় বছর পর্যন্ত সাবেক মিসরীয় রাজতন্ত্রের কিছু আইন চালু থাকে তাহলে তাতে অবাক হবার কি আছে? আর এ থেকে আল্লাহর নবীকে মিসরে আল্লাহর দীন প্রবর্তনের জন্য নয় বরং বাদশাহর দীন প্রবর্তনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল, এ যুক্তির উদ্ভব হয় কেমন করে? তবে দেশে যখন বাদশাহর দীন জারী ছিলই তখন হযরত ইউসুফের নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাকে কার্যকর করা তাঁর মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না কেন, এ প্রশ্নের জবাবও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে সহজেই পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাসন কালের প্রথম যুগে যতদিন ইসলামী আইন জারি হয়নি ততদিন লোকেরা পুরাতন পদ্ধতি অনুযায়ী শরাব পান করতে থাকে। কিন্তু নবী (সা) নিজেও কি শরাব পান করেন? লোকেরা সুদী লেনদেন করতো। কিন্তু তিনি নিজেও কি সুদী লেনদেন করেন? লোকেরা মুতা বিয়ে করতে থাকে এবং দুই সহোদরা বোনকে একসাথে বিয়ে করতে থাকে। কিন্তু নবী (সা)ও কি এমনটি করেন? এ থেকে জানা যায়, বাস্তব অক্ষমতার কারণে ইসলামের আহবায়কের ইসলামী বিধান জারি করার জন্য পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়া একটি ভিন্ন ব্যাপার এবং এ পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হওয়ার যুগে তাঁর নিজের জাহেলী পদ্ধতিকে কার্যকর করা এর থেকে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নতর ব্যাপার। পর্যায়ক্রমের কারণে যে ছুট দেয়া হয় তা অন্যদের জন্য। আহবায়ক নিজে এমন সব পদ্ধতির মধ্য থেকে কোন একটিকে বাস্তবায়িত করবেন যেগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে, এটা আসলে তাঁর নিজের কাজ নয়।

قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿۷۷﴾ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۷۸﴾ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿۷۹﴾

এ ভাইয়েরা বললো, "এ যদি চুরি করে থাকে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই, কারণ এর আগে এর ভাইও (ইউসুফ) চুরি করেছিল।"[৬১] ইউসুফ তাদের একথা শুনে আত্মস্থ করে ফেললো, সত্য তাদের কাছে প্রকাশ করলো না, শুধুমাত্র (মনে মনে) এতটুকু বলে থেমে গেলো, "বড়ই বদ তোমরা, (আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার ওপর) এই যে দোষারোপ তোমরা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ প্রকৃত সত্য ভালোভাবে অবগত।"

তারা বললো, " হে ক্ষমতাসীন সরদার (আযীয)![৬২] এর বাপ অত্যন্ত বৃদ্ধ, এর জায়গায় আপনি আমাদের কাউকে রেখে দিন। আমরা আপনাকে বড়ই সদাচারী ব্যক্তি হিসেবে পেয়েছি।" ইউসুফ বললেন, "আল্লাহর পানাহ! অন্য কাউকে আমরা কেমন করে রাখতে পারি? যার কাছে আমরা নিজেদের জিনিস পেয়েছি[৬৩] তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে রাখলে আমরা জালেম হয়ে যাবো।"

৬১. আসলে নিজেদের অপমান স্খলন করার জন্য তারা একথা বলে। প্রথমে তারা বলে এসেছে, আমরা চোর নই। আর এখন দেখছে, তাদের ভাইয়ের থলের মধ্য থেকে হারানো জিনিসটি বের হচ্ছে। কাজেই এখন সংগে সংগেই একটি মিথ্যা কথা বলে সেই ভাই থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে নিয়েছে এবং তার সাথে তার আগের ভাইকেও জড়িয়ে ফেলেছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, হযরত ইউসুফের অবর্তমানে বিন ইয়ামিনের সাথে এ ভাইয়েরা কোন্ ধরনের ব্যবহার করে আসছে এবং কি কারণে তার ও হযরত ইউসুফের মনে এ আকাংখা জেগেছে যে, সে তাদের সাথে ফিরে না গিয়ে ওখানে থেকে যাক।

৬২. এখানে "আযীয" শব্দটি হযরত ইউসুফের জন্য ব্যবহার করার কারণে তাফসীরকারগণ ধারণা করে নিয়েছেন যে, যুলায়খার স্বামী ইতিপূর্বে যে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন হযরত ইউসুফ সেই পদেই অধিষ্ঠিত হন। এরপর আরো ধারণা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী আযীয মারা গিয়েছিল এবং হযরত ইউসুফ তার স্থলাভিষিক্ত হন। যুলায়খাকে নতুন করে অলৌকিকভাবে যুবতী বানিয়ে দেয়া হয় এবং মিসরের বাদশাহ হযরত

ইউসুফের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। এমন কি বাসর রাতে হযরত ইউসুফের সাথে যুলায়খার যে কথাবার্তা হয় তাও পর্যন্ত আমাদের একশ্রেণীর তাফসীরকারগণের কাছে পৌছে যায়। অথচ একথাগুলো সবই কাল্পনিক। "আযীয" শব্দটি সম্পর্কে আমি আগেই একথা বলে এসেছি যে, মিসরে এটি কোন বিশেষ পদবী হিসেবে চিহ্নিত ছিল না বরং নিছক "কর্তৃত্বশালী" অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত মিসরে বড় বড় লোকদের জন্য এ ধরনের কিছু শব্দ পারিভাষিক অর্থে প্রচলিত ছিল, যেমন আমাদের দেশে "সরকার" শব্দটির প্রচলন দেখা যায়। এরি অনুবাদ কুরআনে "আযীয" শব্দের মাধ্যমে করা হয়েছে। আর যুলায়খার সাথে হযরত ইউসুফের বিয়ের যে গল্প ফাঁদা হয়েছে এর ভিত্তি শুধু এতটুকুই যে, বাইবেল ও তালমূদে পোটিফেরের মেয়ে আস্‌নাত–এর সাথে তার বিয়ের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ওদিকে যুলায়খার স্বামীর নামও ছিল পোটিফর। এ ঘটনাগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ধৃত হতে হতে মুফাস্‌সিরগণের কাছে পৌছে যায়। তারপর গুজব ও জনশ্রুতির বিস্তার লাভের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। পোটিফের সহজেই পোটিফর হয়ে গেছে। মেয়ে হয়ে গেছে স্ত্রী। আর এ স্ত্রী নিশ্চিতভাবেই হয়ে গেছে যুলায়খা। কাজেই তার সাথে হযরত ইউসুফের বিয়ে দেবার জন্য পোটিফরকে হত্যা করা হয়েছে। এভাবেই "ইউসুফ যুলায়খার" উপাখ্যান পূর্ণতা লাভ করেছে।

৬৩. এখানে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে একবার তলিয়ে দেখুন। এখানে "চোর" বলা হচ্ছে না বরং কেবল এতটুকু বলা হচ্ছে, "যার কাছে আমরা আমাদের জিনিস পেয়েছি।" শরীয়াতী পরিভাষায় একেই বলা হয় "তাওরীয়া" অর্থাৎ "সত্যকে সুকৌশলে গোপন করা"। যখন কোন মজলুমকে জালেমের হাত থেকে বাঁচাবার অথবা কোন বড় আকারের জুলুমের প্রতিরোধ করার জন্য প্রকৃত ঘটনার বিপরীত কথা বলা বা সত্য বিরোধী বাহানাবাজী করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না তখন এ অবস্থায় একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি সুস্পষ্ট মিথ্যা এড়িয়ে এমন কথা বলবে বা এমন কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করবে যার ফলে প্রকৃত সত্যকে গোপন করে দুষ্কৃতিকে রোধ করা যেতে পারে। এমনটি করা শরীয়াত ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে বৈধ, তবে এখানে শর্ত থাকবে যে, নিছক কার্যোদ্ধার করার জন্য এমনটি করা যাবে না বরং কোন বড় আকারের দুষ্কৃতি দূর করাই হবে উদ্দেশ্য। এখন এ সমগ্র ব্যাপারটিতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেমন ধরনের বৈধ তাওরীয়ার শর্ত পূরণ করেছেন দেখুন ঃ ভাইয়ের সমতিক্রমে তার মালপত্রের মধ্যে নিজের পেয়ালাটি রেখে দিয়েছেন। কিন্তু কর্মচারীদেরকে একথা বলেননি যে, এর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের করো। তারপর সরকারী কর্মচারীরা যখন চুরির অভিযোগে তাদেরকে ধরে এনেছে তখন কোন প্রকার হৈ চৈ না করে নীরবে তাদের মালপত্র তল্লাশী করতে শুরু করেছেন। এরপর যখন এ ভাইয়েরা বললো, বিন ইয়ামীনের জায়গায় আমাদের কাউকে রাখুন তখন এর জবাবে তাদেরই কথা তাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, তোমরাইতো ফতোয়া দিয়েছিলে, যার মালপত্রের মধ্য থেকে পেয়ালা বের হবে তাকেই রেখে দেয়া হবে। কাজেই এখন তোমাদের সামনে বিন ইয়ামীনের মালপত্রের মধ্য থেকে আমাদের জিনিস বের হয়েছে এবং তাকেই আমরা রেখে দিচ্ছি। অন্যকে তার জায়গায় আমরা কেমন করে রাখতে পারি? এ ধরনের তাওরীয়ার দৃষ্টান্ত নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসেও পাওয়া যাবে। কোন যুক্তি দিয়ে নৈতিক দৃষ্টিতে একে দোষণীয়ও বলা যেতে পারে না।

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ
اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِىْ
يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِىْۤ اَبِىْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ
لِىْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿۸۰﴾ اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۱﴾
وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْۤ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ؕ وَاِنَّا
لَصٰدِقُوْنَ ﴿۸۲﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ
عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۸۳﴾

১০ রুকূ'

যখন তারা ইউসুফের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেলো তখন একান্তে পরামর্শ করতে লাগলো। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বয়সে বড় ছিল সে বললো ঃ "তোমরা কি জান না, তোমাদের বাপ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে কি অংগীকার নিয়েছেন এবং ইতিপূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যেসব বাড়াবাড়ি করেছো তাও তোমরা জানো। এখন আমি তো এখান থেকে কখনোই যাবো না যে পর্যন্ত না আমার বাপ আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে কোন ফায়সালা করে দেন, কেননা তিনি সবচেয়ে ভালো ফায়সালাকারী। তোমরা তোমাদের বাপের কাছে ফিরে গিয়ে বলো, "আব্বাজান, আপনার ছেলে চুরি করেছে, আমরা তাকে চুরি করতে দেখিনি, যতটুকু আমরা জেনেছি শুধু ততটুকুই বর্ণনা করছি এবং অদৃশ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করা তো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। আমরা যে পল্লীতে ছিলাম সেখানকার লোকজনদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং যে কাফেলার সাথে আমরা ছিলাম তাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন, আমরা যা বলছি সত্য বলছি।"

ইয়াকূব এ কাহিনী শুনে বললো, "আসলে তোমাদের মন তোমাদের জন্য আরো একটি বড় ঘটনাকে সহজ করে দিয়েছে।[৬৪] ঠিক আছে, এ ব্যাপারেও আমি সবর করবো এবং ভালো করেই করবো। হয়তো আল্লাহ এদের সবাইকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দেবেন। তিনি সবকিছু জানেন এবং তিনি জ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত কাজ করেন।"

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿৮৪﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿৮৫﴾ قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿৮৬﴾ يٰبَنِىَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿৮৭﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿৮৮﴾

তারপর সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে গেলো এবং বলতে লাগলো, "হায় ইউসুফ"— সে মনে মনে দুঃখে ও শোকে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছিল এবং তার চোখগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল,—ছেলেরা বললো, "আল্লাহর দোহাই। আপনি তো শুধু ইউসুফের কথাই স্মরণ করে যাচ্ছেন। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার শোকে আপনি নিজেকে দিশেহারা করে ফেলবেন অথবা নিজের প্রাণ সংহার করবেন।" সে বললো, "আমি আমার পেরেশানি এবং আমার দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে করছি না। আর আল্লাহর ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি তোমরা ততটুকু জানো না। হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু অনুসন্ধান চালাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। তাঁর রহমত থেকে তো একমাত্র কাফেররাই নিরাশ হয়।"

যখন তারা মিসরে গিয়ে ইউসুফের সামনে হাযির হলো তখন আরয করলো, "হে পরাক্রান্ত শাসক! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছি এবং আমরা মাত্র সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের পূর্ণমাত্রায় শস্য দিয়ে দিন এবং আমাদেরকে দান করুন,[৬৫] *আল্লাহ দানকারীদেরকে প্রতিদান দেন।"*

৬৪. অর্থাৎ আমার ছেলের চারিত্রিক সততা সম্পর্কে আমি ভালোভাবেই জানি। তার একটি পেয়ালা চুরির দোষে অভিযুক্ত হবার কথা মেনে নেয়া তোমাদের জন্য সহজ হতে

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَٰطِـِٔينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٩٢﴾ ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

(একথা শুনে ইউসুফ আর চুপ থাকতে পারলো না) সে বললো, "তোমরা কি জানো, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে?" তারা চমকে উঠে বললো, "হায় তুমিই ইউসুফ নাকি?" সে বললো, "হাঁ, আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আসলে কেউ যদি তাকওয়া ও ছবর অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহর কাছে এ ধরনের সৎলোকদের কর্মফল নষ্ট হয়ে যায় না।" তারা বললো, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে আমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যথার্থই আমরা অপরাধী ছিলাম।" সে জবাব দিল, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি সবার প্রতি অনুগ্রহকারী। যাও, আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারার ওপর রেখো, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো।"

পারে। ইতিপূর্বে তোমাদের জন্য তোমাদের এক ভাইকে জেনেবুঝে নিখোজ করে দেয়া এবং তার পোশাকে কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনা খুব সহজ কাজ হয়ে গিয়েছিল। আর এখন অন্য এক ভাইকে সত্যি সত্যি চোর বলে মেনে নেয়া এবং আমাকে এসে তার খবর দেয়াও তেমনি সহজ কাজ হয়ে গেছে।

৬৫. অর্থাৎ আমাদের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে আপনি যাকিছু দেবেন তাই যেন আপনি আমাদের দান করছেন বলে মনে করা হবে। এ শস্যের মূল্য হিসেবে যে অর্থ আমরা দিচ্ছি তা আমাদের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শস্যের মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবার অবশ্যি যোগ্যতা রাখে না।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿٩٩﴾

১১ রুকূ'

কাফেলাটি যখন (মিসর থেকে) রওয়ানা দিল তখন তাদের বাপ (কেনানে) বললো, "আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি,[৬৬] তোমরা যেন আমাকে একথা বলো না যে, বুড়ো বয়সে আমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে।" ঘরের লোকেরা বললো, "আল্লাহর কসম, আপনি এখনো নিজের সেই পুরাতন পাগলামি নিয়েই আছেন।"[৬৭]

তারপর যখন সুখবর বহনকারী এলো তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকূবের চেহারার ওপর রাখলো এবং অকস্মাত তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। তখন সে বললো, "আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব কথা জানি যা তোমরা জানো না?" সবাই বলে উঠলো, "আব্বাজান! আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করুন, সত্যিই আমরা অপরাধী ছিলাম।" তিনি বললেন, "আমি আমার রবের কাছে তোমাদের মাগফেরাতের জন্য আবেদন জানাবো, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"

তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে পৌঁছুলো[৬৮] তখন সে নিজের বাপ–মাকে নিজের কাছে বসালো[৬৯] এবং (নিজের সমগ্র পরিবার পরিজনকে) বললো, "চলো, এবার শহরে চলো, আল্লাহ চাহেতো শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করবে।"

৬৬. আল্লাহর নবীগণ কেমন অসাধারণ শক্তির অধিকারী হয়ে থাকেন, এ ঘটনা থেকে সে সম্পর্কে ধারণা জন্মে। একদিকে হযরত ইউসুফের (আ) জামা নিয়ে মিসর থেকে কাফেলা সবেমাত্র রওয়ানা দিচ্ছে আর অন্যদিকে শত শত মাইল দূরে হযরত ইয়াকূব

(আ) তার গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু এ থেকে একথাও জানা যায় যে, নবীগণের এ শক্তিগুলো আসলে তাঁদের সহজাত ছিল না বরং এগুলো আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছিলেন এবং আল্লাহ যখন ও যে পরিমাণ চাইতেন এ শক্তিকে কাজে লাগানোর সুযোগ দিতেন। হযরত ইউসুফ (আ) বহু বছর যাবত মিসরে রয়েছেন এবং সে সময় হযরত ইয়াকূব (আ) কখনো তাঁর গন্ধ পাননি। কিন্তু এখন হঠাৎ ঘ্রাণ শক্তি এত তীব্র হয়ে গেলো যে, তাঁর জামা মিসর থেকে চলা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই তিনি তার সুগন্ধ পেতে শুরু করলেন।

এখানে এ আলোচনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, একদিকে কুরআন হযরত ইয়াকূব আলাইহিস সালামকে এভাবে পয়গম্বরের বিপুল মর্যাদা সহকারে পেশ করছে কিন্তু অন্যদিকে বনী ইসরাঈল তাঁকে পেশ করছে আরবের একজন সাধারণ বেদুইনের মতো করে। বাইবেলের বর্ণনা মতে, যখন ছেলেরা এসে খবর দিল, "ইউসুফ এখনো বেঁচে আছে এবং সে-ই সারা মিসর দেশের শাসনকর্তা তখন ইয়াকূব হতভম্ব হয়ে গেলেন। কেননা তিনি এটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না......... পরে যখন তিনি তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য ইউসুফের পাঠানো শকটগুলো দেখলেন তখন তাঁর ধড়ে প্রাণ এলো।" (আদি পুস্তক ৪৫ : ২৬-২৭)

৬৭. এ থেকে বুঝা যায়, সমগ্র পরিবারে হযরত ইউসুফ (আ) ছাড়া তাদের পিতার মর্যাদা উপলব্ধিকারী আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। হযরত ইয়াকূব (আ) নিজেও তাদের এ মানসিক ও নৈতিক অধোপতনের কারণে হতাশ ছিলেন। গৃহের প্রদীপের আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিল কিন্তু গৃহবাসীরা নিজেরাই আঁধারের মধ্যে বাস করছিল। তাদের দৃষ্টিতে তিনি একটি পোড়া মাটি ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অধিকাংশই প্রকৃতির এ নির্মম পরিহাসের শিকার হয়েছেন।

৬৮. বাইবেলের বর্ণনামতে এ সময় মিসরে আগমনকারী হযরত ইয়াকূবের (আ) পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট ৬৭ ছিল। অন্যান্য পরিবারের যেসব মেয়েকে হযরত ইয়াকূবের (আ) পরিবারে বিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এ সংখ্যার অন্তরভুক্ত করা হয়নি। এ সময় হযরত ইয়াকূবের (আ) বয়স ছিল ১৩০ বছর এবং এরপরও তিনি মিসরে ১৭ বছর জীবিত থাকেন।

এখানে একজন জ্ঞানানুসন্ধানীর মনে প্রশ্ন জাগে, বনী ইসরাঈল যখন মিসরে প্রবেশ করে তখন হযরত ইউসুফ (আ) সহ তাদের সংখ্যা ছিল ৬৮ এবং প্রায় ৫ শত বছর পর যখন তারা মিসর থেকে বের হয় তখন তাদের সংখ্যা ছিল কয়েক লাখ। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী মিসর ত্যাগ করার পরের বছর সিনাইয়ের মরু এলাকায় হযরত মূসা (আ) তাদের যে আদমশুমারী করান তাতে কেবলমাত্র যুদ্ধ করতে সমর্থ যুবকদের সংখ্যা ৬,০৩,৫৫০ ছিল। এর মানে এ দাঁড়ায়, নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে সব শুদ্ধ তাদের সংখ্যা হবে অন্তত ২০ লাখ। কোন হিসেবে কি ৬৮ জন থেকে ৫শত বছরে বংশবৃদ্ধি পেয়ে ২০ লাখ হতে পারে? যদি ধরা যায়, সারা মিসরের জনসংখ্যা এ সময় ছিল ২ কোটি (যা অবশ্যি খুব বেশী অতিরঞ্জিত বিবেচিত হবে) তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়াবে যে, শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের সংখ্যাই সেখানে ছিল শতকরা ১০ ভাগ। শুধুমাত্র বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে একটি পরিবারের লোকসংখ্যা কি এ পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে? এ প্রশ্নটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রকাশ ঘটে। একথা ঠিক ৫শত বছরে একটি পরিবারের

লোকসংখ্যা এত বেশী বাড়তে পারে না। কিন্তু বনী ইসরাঈল ছিল নবীদের সন্তান। তাদের নেতা হযরত ইউসুফের (আ) বদৌলতে তারা মিসরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। এ ইউসুফ (আ) নিজেই ছিলেন নবী। তাঁর পর থেকে চার পাঁচশো বছর পর্যন্ত দেশের শাসন কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে ছিল। এ সময় নিশ্চয়ই তারা মিসরে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করে থাকবেন। মিসরবাসীদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের কেবল ধর্মই নয়, তামাদ্দুন এবং সমগ্র জীবন ব্যবস্থাই মিসরীয় অমুসলিমদের থেকে আলাদা হয়ে বনী ইসরাঈলের রঙে রঞ্জিত হয়ে গিয়ে থাকবে। মিসরীয়রা তাদের সবাইকে ঠিক তেমনি আগন্তুক গণ্য করে থাকবে যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুরা ভারতীয় মুসলমানদেরকে গণ্য করে থাকে। অনারব মুসলমানদের ওপর আজ 'মোহামেডান' শব্দটি যেভাবে লাগানো হয় তাদের ওপর ঠিক তেমনিভাবেই 'ইসরাঈলী' শব্দটি লাগানো হয়ে থাকবে। আর তাছাড়া তারা নিজেরাও দীনী ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং বিয়ে–শাদীর সম্পর্কের কারণে অমুসলিম মিসরীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বনী ইসরাঈলের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়ে থাকবে। এ কারণে যখন মিসরে জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ার উঠলো তখন কেবলমাত্র বনী ইসরাঈলই নির্যাতনের শিকার হলো না বরং মিসরীয় মুসলিমরাও তাদের সাথে একইভাবে নির্যাতীত হলো। আর বনী ইসরাঈল যখন মিসর ত্যাগ করলো তখন মিসরীয় মুসলমানরাও তাদের সাথে বের হলো এবং তাদের সবাইকে বনী ইসরাঈলের সাথে গণ্য করা হতে থাকলো।

বাইবেলের বিভিন্ন ইংগিত থেকে আমাদের এ ধারণার সমর্থন মেলে। উদাহরণ স্বরূপ "যাত্রা পুস্তকে" যেখানে বনী ইসরাঈলদের মিসর থেকে বের হবার অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বাইবেল লেখক বলছেন ঃ "আর তাহাদের সাথে মিশ্রিত লোকদের মহাজনতাও গেলো।" (১২ঃ৩৮) অনুরূপভাবে "গণনা পুস্তকে"ও তিনি আবার বলছেন ঃ "আর তাহাদের মধ্যবর্তী মিশ্রিত লোকেরা লোভাতুর হইয়া উঠিল।" (১১ঃ৪) তারপর পর্যায়ক্রমে এ অইসরাঈলী মুসলমানদের জন্য "আগন্তুক" ও "পরদেশী" পরিভাষা ব্যবহার করা হতে থাকে। বস্তুত তাওরাতে হযরত মূসাকে যেসব বিধান দেয়া হয় তার মধ্যে আমরা পাই ঃ

> " তোমরা ও তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশী লোক, উভয়ের জন্য একই ব্যবস্থা হইবে ; ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে পালনীয় চিরস্থায়ী বিধি। সদা প্রভুর সামনে তোমরা ও বিদেশীয়েরা, উভয়ে সমান। তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে বসবাসকারী বিদেশীয়দের জন্য একই ব্যবস্থা ও একই শাসন হইবে।"
>
> (গণনা পুস্তক ১৫ঃ ১৫–১৬)

"কি স্বজাতীয় কি বিদেশী যে ব্যক্তি নিসংকোচে পাপ করে, সে সদাপ্রভুর অবমাননা করে, সেই ব্যক্তি আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।" (গণনা পুস্তক ১৫ঃ৩০)

"তোমরা তোমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে, চাই স্বদেশী হোক বা বিদেশী হোক, ন্যায্য বিচার করিও।" (দ্বিতীয় বিবরণ ১ঃ১৬)

আল্লাহর কিতাবে অইসরাঈলীদের জন্য আসলে কি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল যাকে অনুবাদকরা 'বিদেশী" বানিয়ে রেখে দিয়েছে, সেটা এখন অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা কঠিন।

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَقَالَ يَا أَبَتِ
هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ
بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ
أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ
لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

(শহরে প্রবেশ করার পর) সে নিজের বাপ-মাকে উঠিয়ে নিজের পাশে সিংহাসনে বসালো এবং সবাই তার সামনে স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় ঝুঁকে পড়লো।[৭০] *ইউসুফ বললো, "আব্বাজান! আমি ইতিপূর্বে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম এ হচ্ছে তার তা'বীর। আমার রব তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ হিসেবে তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এনে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আসলে আমার রব অননুভূত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন। নিসন্দেহে তিনি সবকিছু জানেন ও সুগভীর প্রজ্ঞার অধিকারী।*

৬৯. তালমূদে লিখিত হয়েছে, হযরত ইয়াকূবের (আ) আগমন সংবাদ যখন রাজধানীতে এসে পৌছুল তখন হযরত ইউসুফ (আ) রাজ্যের বড় বড় আমীর উমরাহ, উচ্চ পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ ও বিরাট এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে বের হলেন। অত্যন্ত মর্যাদা ও শান-শওকতের সাথে তাঁদেরকে শহরে নিয়ে এলেন। সেদিনটি সেখানে ছিল উৎসবের দিন। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সবাই সেদিন এ শোভাযাত্রা দেখতে জমা হয়েছিল। সারা দেশে আনন্দের ঢেউ প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

৭০. এ "সিজদাহ" শব্দটি বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে। এমনকি একটি দল তো এ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে বাদশাহ ও পীরদের জন্য "আদবের সিজদাহ" ও "সম্মান প্রদর্শনের সিজদাহ"-এর বৈধতা আবিষ্কার করেছেন। এর দোষমুক্ত হবার জন্য অন্য লোকদের এ ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে যে, আগের নবীদের শরীয়াতে কেবলমাত্র ইবাদাতের সিজদা আল্লাহ ছাড়া আর সবার জন্য হারাম ছিল। এ ছাড়া যে সিজ্দার মধ্যে ইবাদাতের অনুভূতি নেই তা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্যও করা যেতে পারতো। তবে মুহাম্মাদী শরীয়াতে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের জন্য সবরকমের সিজদা হারাম করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আসলে "সিজদাহ" শব্দটিকে বর্তমান ইসলামী পরিভাষার অর্থে গ্রহণ করার ফলেই যাবতীয় বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ হাত, হাঁটু ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে দেয়া। অথচ

সিজদার মূল অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র ঝুঁকে পড়া। আর এখানে এ শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কারো প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার, কাউকে অভ্যর্থনা জানাবার অথবা নিছক কাউকে সালাম করার জন্য বুকে দু'হাত বেঁধে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়ার রেওয়াজ প্রাচীন যুগের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। (এবং আজো দুনিয়ার কোন কোন দেশে এর প্রচলন আছে)। এ ধরনের ঝুঁকে পড়ার জন্য আরবীতে "সিজদাহ" এবং ইংরেজীতে Bow শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাইবেলে আমরা এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাই, যা থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন যুগে এ পদ্ধতিটি সাংস্কৃতিক জীবনের অংশ ছিল। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এক জায়গায় বলা হয়েছে : তিনি নিজের তাঁবুর দিকে তিনটি লোককে আসতে দেখলেন। তাদেরকে অভ্যর্থনা করার জন্য তিনি দৌড়ে গেলেন এবং মাটি পর্যন্ত ঝুঁকে পড়লেন। আরবী বাইবেলে এখানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে :

فَلَمَّا نَظَرَ رَكَضَ لاِسْتِقْبَالِهِمْ مِنْ بَابِ الْخَيْمَةِ وَسَجَدَ اِلَى الاَرْضِ

(تكوين : ١٨-٣)

তারপর যেখানে বলা হচ্ছে, হেতের সন্তানরা হযরত সারাকে দাফন করার জন্য বিনামূল্যে কবরের জন্য জমি দান করে, সেখানে উর্দূ বাইবেলে যা বলা হয়েছে তার বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়। "ইবরাহীম উঠে বনী হেতের সামনে, যারা সেই দেশের বাসিন্দা ছিল, কুর্নিশ করলেন এবং তাদের সাথে এভাবে আলাপ করলেন।" (বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে : তখন আব্রাহাম উঠিয়া তদ্দেশীয় লোকদিগের, অর্থাৎ হেতের সন্তানগণের কাছে প্রণিপাত করিলেন ও সম্ভাসন করিয়া কহিলেন,) তারপর যখন তারা শুধু কবরের জমিই নয়, পুরো একটি ক্ষেত এবং একটি গুহা দান করে তখন "ইবরাহীম সেই দেশীয় লোকদের সামনে মাথা নত করলেন (বাংলা বাইবেলে বলা হয়েছে : তখন আব্রাহাম তদ্দেশীয় লোকদের সামনে প্রণিপাত করিলেন)। কিন্তু আরবী অনুবাদে এ উভয় জায়গায় কুর্নিশ করা, প্রণিপাত করা, মাথা নত করা ইত্যাদির জন্য "সিজদাহ" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

فقام ابراهيم وسجد لشعب الارض لبنى حت (تكوين : ٢١ - ٧)

فسجد ابراهيم امام شعب الارض (تكوين : ٢٣ - ١٢)

ইংরেজী বাইবেলে এখানে যে শব্দাবলী ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে :

"Bowed himself towards the ground.

"Bowed himself to the people of the land and Abraham bowed down himself before the people of the land."

এ ধরনের বিষয়ের বহু দৃষ্টান্ত বাইবেলে পাওয়া যায়। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, বর্তমানে ইসলামী পরিভাষায় "সিজদাহ" বলতে যা বুঝায় এ সিজদাহর অর্থ তা নয়।

যারা বিষয়টির যথার্থ স্বরূপ না জেনে এর ব্যাখ্যায় হালকাভাবে লিখে দিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী শরীয়াতগুলোয় গায়রুল্লাহকে সম্মানের সিজদা অথবা আদবের সিজদা করা জায়েয

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۣ اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٤﴾

হে আমার রব! তুমি আমাকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছো এবং আমাকে কথার গভীরে প্রবেশ করা শিখিয়েছো। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! দুনিয়ায় ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। ইসলামের ওপর আমাকে মৃত্যু দান করো এবং পরিণামে আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তরভুক্ত করো।"[৭১]

হে মুহাম্মাদ! এ কাহিনী অদৃশ্যলোকের খবরের অন্তরভুক্ত, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। নয়তো, তুমি তখন উপস্থিত ছিলে না যখন ইউসুফের ভাইয়েরা একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তুমি যতই চাওনা কেন অধিকাংশ লোক তা মানবে না।[৭২] অথচ তুমি এ খেদমতের বিনিময়ে তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিকও চাচ্ছো না। এটা তো দুনিয়াবাসীদের জন্য সাধারণভাবে একটি নসীহত ছাড়া আর কিছুই নয়।[৭৩]

ছিল তারা নিছক একটি ভিত্তিহীন কথা বলেছেন। ইসলামী পরিভাষায় যাকে সিজদা বলা হয়, যদি সিজদা বলতে তাকেই বুঝানো হয় তাহলে আল্লাহর পাঠানো শরীয়াতে তা কোনদিন গায়রুল্লাহর জন্য জায়েয ছিল না। বাইবেলে উল্লেখিত হয়েছে যে, ব্যাবিলনের পরাধীনতার যুগে বাদশাহ অহশ্বেরশ যখন হামানকে নিজের প্রধান অধ্যক্ষ করলেন এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য তাকে সিজদা করার জন্য সবাইকে হুকুম দিলেন তখন বনী ইসরাঈলের পরম খোদাভক্ত ওলী মর্দখয় (মর্দকী) তা করতে অস্বীকার করলেন। (ইষ্টের ৩ঃ১–২) তালমূদে এ ঘটনাটির ব্যাখ্যা প্রসংগে এর যে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য ঃ

"বাদশাহর কর্মচারীরা জিজ্ঞেস করলো ঃ ব্যাপার কি, তুমি কেনইবা হামানকে সিজদা করতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছো? আমরাও তো মানুষ কিন্তু আমরা বাদশাহর হুকুম মেনে চলি। তিনি জবাব দিলেন ঃ তোমরা অজ্ঞ, একজন মরণশীল মানুষ, যে কাল মাটির

সাথে মিশে যাবে, সে কি এমন যোগ্যতা রাখে যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেয়া হবে? আমি কি এমন একজনকে সিজদা করবো, যে একটি মহিলার পেট থেকে জন্ম নিয়েছে? যে কাল শিশু ছিল, আজ যুবক হয়েছে, কাল বুড়ো হয়ে যাবে এবং পরশু মারা যাবে? না, আমি তো একমাত্র সেই অনাদি অনন্ত আল্লাহর সামনে মাথা নত করবো যিনি রিচঞ্জীব ও স্বয়ম্ভু........ যিনি বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও শাসক, আমি তো একমাত্র তাঁকেই সম্মান করবো, আর কাউকে নয়।"

কুরআন নাযিলের প্রায় এক হাজার বছর আগে একজন ইসরাঈলী মুমিনের কণ্ঠে এ কথাগুলো উচ্চারিত হয়। কোন অর্থেও গায়রুল্লাহকে সিজদা করা বৈধ এ ধরনের চিন্তার নামগন্ধও এতে পাওয়া যায় না।

৭১. এ সময় হযরত ইউসুফের (আ) কণ্ঠ নিঃসৃত এ বাক্য ক'টি আমাদের সামনে একজন সাচ্চা মুমিনের চরিত্রের একটা অদ্ভুত মনোমুগ্ধকর চিত্র তুলে ধরে। মরু পশুপালক পরিবারের এক ব্যক্তি, যাঁকে তাঁর হিংসুটে ভাইয়েরা মেরে ফেলতে চেয়েছিল, জীবনের উত্থান–পতন দেখতে দেখতে অবশেষে পার্থিব উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। তার দুর্ভিক্ষ পীড়িত পরিবারবর্গ তারই করুণা ভিখারী হয়ে তার সামনে এসে হাযির হয়েছে এবং এ সাথে এসেছে তার সেই হিংসুটে ভাইয়েরা যারা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। তারা সবাই তার রাজকীয় সিংহাসনের সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়ার সাধারণ রীতি অনুযায়ী এটি ছিল অহংকার, অভিযোগ ও দোষারোপ করার এবং তিরস্কার ও ভর্ৎসনার তীর বর্ষণ করার উপযুক্ত সময়। কিন্তু আল্লাহর সত্যিকার অনুগত একজন মানুষ এ সময় কিছুটা ভিন্ন ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীর প্রকাশ ঘটান। তিনি নিজের এ উন্নতির জন্য অহংকার করার পরিবর্তে যে আল্লাহ তাকে এ মর্যাদা দান করেছেন তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেন। তার পরিবারের লোকেরা জীবনের প্রথম দিকে তার ওপর যে জুলুম অত্যাচার চালিয়েছিল সে জন্য তিনি তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন না। বরং আল্লাহ এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্নতার পর তাদেরকে আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এ বলে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি হিংসুটে ভাইদের বিরুদ্ধে মুখে অভিযোগের একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। এমন কি একথাও বলেন না যে, তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল। বরং নিজেই এভাবে তাদের সাফাই গাইছেন যে, শয়তান আমার ও তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে। আবার সেই বিরোধের খারাপ দিক বাদ দিয়ে তার এ ভালো দিকটি পেশ করছেন যে, আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন সে জন্য এ সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করেছেন। অর্থাৎ ভাইদের দ্বারা শয়তান যা কিছু করায় তার মধ্যে আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী আমার জন্য কল্যাণ ছিল। কয়েক শব্দে এসব কিছু প্রকাশ করার পর তিনি স্বতস্ফূর্তভাবে নিজের প্রভু–আল্লাহর সামনে নত হন এবং তাঁর প্রতি এ বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন ঃ তুমিই আমাকে বাদশাহী দান করেছো এবং এমন সব যোগ্যতা দান করেছো যার বদৌলতে আমি জেলখানায় পচে মরার বদলে আজ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রটির ওপর শাসন কর্তৃত্ব চালাচ্ছি। সবশেষে তিনি আল্লাহর কাছে যা কিছু চান তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়ায় যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন যেন তোমার বন্দেগী ও দাসত্বে অবিচল থাকি আর যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেই তখন আমাকে সৎ বান্দাদের সাথে মিশিয়ে দিয়ো। কতই উন্নত, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র এ চারিত্রিক আদর্শ!

হযরত ইউসুফের এ মূল্যবান ভাষণটিও বাইবেল ও তালমূদে কোন স্থান পায়নি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এ কিতাব দু'টি অপ্রয়োজনীয় গল্প কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণে ভরা। অথচ যেসব বিষয় নৈতিক মূল্যমান ও মূল্যবোধের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং যার সাহায্যে নবীগণের মূল শিক্ষা, তাঁদের যথার্থ মিশন এবং তাঁদের সীরাতের শিক্ষণীয় দিকগুলোর ওপর আলোকপাত হয়, এ কিতাব দু'টিতে সেগুলোর কোন উল্লেখই নেই।

এখানে এ কাহিনী শেষ হচ্ছে। তাই পাঠকদেরকে পুনর্বার এ সত্যটির ব্যাপারে সজাগ করে দেয়া জরুরী মনে করি যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম, সম্পর্কে কুরআনের এ বর্ণনাটি একান্তই তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বর্ণনা। এটি বাইবেল বা তালমূদের চর্বিতচর্বন নয়। তিনটি কিতাবের তুলনামূলক অধ্যয়নের পর একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কাহিনীটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশে কুরআনের বর্ণনা অন্য দু'টি থেকে আলাদা। কোন কোন জিনিস কুরআন তাদের চেয়ে বেশী বর্ণনা করে, কোন কোনটা কম এবং কোন কোনটায় তাদের বর্ণনার প্রতিবাদ করে। কাজেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী ইসরাঈলের থেকে এ কাহিনীটি শুনে থাকবেন এবং তারি ভিত্তিতে এটি বর্ণনা করেন, একথা বলার সুযোগই কারোর নেই।

৭২. অর্থাৎ এরা এক অদ্ভুত ধরনের হটকারিতার রোগে ভুগছে। তোমার নবুওয়াতের বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য অনেক চিন্তা–ভাবনা ও পরামর্শ করে তারা যে দাবী করেছিল তুমি সংগেসংগেই সবার সামনে তা পূরণ করে দিয়েছো। এখন হয়তো তুমি আশা করছো, এ কুরআন তুমি নিজে রচনা কর না বরং সত্যিই তোমার প্রতি অহীর মাধ্যমে নাযিল হয়, একথা মেনে নিতে তারা আর ইতস্তত করবে না। কিন্তু নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, এরা এখনো মানবে না এবং নিজেদের অস্বীকৃতির ওপর অবিচল থাকার জন্য আরেকটি বাহানা খুঁজে বের করবে। কেননা, এদের না মানার আসল কারণ এটা নয় যে, তোমার সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হবার জন্য এরা কোন যুক্তিসংগত প্রমাণ চাচ্ছিল এবং তা এরা এখনো পায়নি। বরং এর কারণ শুধুমাত্র একটিই যে, এরা তোমার কথা মেনে নিতে রাজী নয়। তাই এরা আসলে মেনে নেবার জন্য কোন প্রমাণ খুঁজে ফিরছে না বরং না মানার জন্য বাহানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন ভুল ধারণা দূর করা এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। যদিও বাহ্যত তাঁকেই সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে দলকে সম্বোধন করে তাদের সমাবেশে এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তাদেরকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অলংকারপূর্ণ বাগধারার মাধ্যমে এ হঠকারিতা সম্পর্কে সতর্ক করা। তারা নিজেদের মাহফিলে তাঁকে ডেকে এনেছিল তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য। সেখানে তারা অকস্মাত দাবী করেছিল, যদি আপনি নবী হয়ে থাকেন তাহলে বলুন বনী ইসরাঈলের মিসর যাবার ঘটনাটা কি ছিল? এর জবাবে তাদেরকে তখনই এবং সেখানেই এ সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনিয়ে দেয়া হয়। আর সর্বশেষে এ ছোট্ট বাক্যটি বলে তাদের সামনে একটি আয়নাও তুলে ধরা হয়েছে যে, ওহে হঠকারীর দল! এ আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখে নাও, তোমরা কোন্ মুখে পরীক্ষা নিতে বসে গিয়েছিলে? বিবেকবান ব্যক্তি তো সত্য প্রমাণ হয়ে গেলে তা মেনে নেয়, এ জন্যই সে পরীক্ষা নিয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা নিজেদের মনের মতো প্রমাণ পেয়ে গেলেও তা মেনে নাও না।

وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ﴿١٠٦﴾ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾

১২ রুকূ'

আকাশসমূহে[৭৪] ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন রয়েছে, যেগুলো তারা অতিক্রম করে যায় কিন্তু সেদিকে একটুও দৃষ্টিপাত করে না।[৭৫] তাদের বেশীর ভাগ আল্লাহকে মানে কিন্তু তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করে।[৭৬] তারা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, আল্লাহর আযাবের কোন আকস্মিক আক্রমণ তাদেরকে গ্রাস করে নেবে না অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের ওপর সহসা কিয়ামত এসে যাবে না?[৭৭]

৭৩. ওপরের সতর্কীকরণের পর এটি দ্বিতীয় সতর্কীকরণ। তবে ওর তুলনায় এর মধ্যে তিরস্কারের দিকটি কম এবং উপদেশের অংশ বেশী। এ উক্তিটিও বাহ্যত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে করা হয়েছে কিন্তু আসলে এখানে কাফেরদের সমাবেশকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে একথা বুঝানোই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহর বান্দারা। একটু ভেবে দেখো, তোমাদের এ হঠকারিতার এখানে অবকাশ কোথায়? যদি পয়গম্বর নিজের কোন ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য দাওয়াত ও প্রচারের এ কাজ চালু করে থাকতেন অথবা নিজের জন্য তিনি কিছু চাইতেন তাহলে অবশ্যি তোমাদের জন্য একথা বলার সুযোগ ছিল যে, আমরা এ ধরনের মতলবী লোকের কথা কেন মানবো? কিন্তু তোমরা দেখছো, এ ব্যক্তি নিস্বার্থ, তোমাদের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের ভালোর জন্য নসীহত করে যাচ্ছেন এবং এর মধ্যে তার নিজের কোন স্বার্থ লুকিয়ে নেই। কাজেই এ ধরনের হঠকারিতার সাহায্যে এর মোকাবিলা করার পেছনে কি যুক্তি আছে? যে ব্যক্তি সবার ভালোর জন্য নিস্বার্থভাবে একটি কথা বলে। তার বিরুদ্ধে খামখা জিদ ধরে বসে থাকা কেন? খোলা মনে তার কথা শোনো। ভালো লাগলে মেনে নাও, ভালো না লাগলে মানবে না।

৭৪. ওপরের এগারটি রুকূ'তে হযরত ইউসুফের (আ) কাহিনী শেষ হয়েছে। যদি নিছক গল্প বলা আল্লাহর অহীর উদ্দেশ্য হতো তাহলে ভাষণ এখানেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু এখানে তো কোন উদ্দেশ্য সামনে রেখেই গল্প বলা হয়। এ উদ্দেশ্য প্রচার করার যে কোন সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করতে মোটেই ইতস্তত করা হয় না। এখন যেহেতু লোকেরা নিজেরাই নবীকে ডেকে এনেছিল এবং গল্প শোনার জন্য কান খাড়া করেছিল, তাই তাদের ফরমায়েশী কথা শেষ হতেই নিজের উদ্দেশ্যমূলক কয়েকটি বাক্যও বলে দেয়া হলো। অতি সংক্ষেপে এ কয়েকটি বাক্যে উপদেশ ও দাওয়াতের সমস্ত বিষয়বস্তু একত্র করে দেয়া হয়েছে।

৭৫. লোকদেরকে তাদের গাফলতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি জিনিস নিছক একটি জিনিসই নয় বরং সত্যের প্রতি ইংগিতকারী একটি নিদর্শনও। যারা এ জিনিসগুলোকে শুধুমাত্র একটি জিনিস হিসেবে দেখে তারা মানুষের মতো নয় বরং পশুর মতো দেখে। পানিকে পানি, গাছকে গাছ এবং পাহাড়কে পাহাড় তো পশুরাও দেখে-থাকে এবং নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রত্যেকটি পশু এগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্রও জানে। কিন্তু মানুষকে যে উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি সহকারে চিন্তা–ভাবনা করার জন্য মস্তিষ্ক দান করা হয়েছে তা শুধু এ জন্য নয় যে, মানুষ সেগুলো দেখবে এবং সেগুলোর ব্যবহার ক্ষেত্র জানবে বরং মানুষ সত্য অনুসন্ধান করবে এবং এ নিদর্শনগুলোর সাহায্যে তাকে চিনে নেবে, এটিই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ গাফলতির মধ্যে পড়ে আছে। আর এ গাফলতিই তাদেরকে গোমরাহীতে নিক্ষেপ করেছে। যদি মনের দুয়ারে এ তালা না লাগিয়ে নেয়া হতো, তাহলে নবীদের কথা বুঝা এবং তাঁদের নেতৃত্ব থেকে ফায়দা হাসিল করা লোকদের জন্য এত কঠিন হতো না।

৭৬. ওপরে যে গাফলতির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে এটা আসলে তার স্বাভাবিক ফল। লোকেরা যখন পথের চিহ্ন থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে তখনই তারা সোজা পথ থেকে সরে গেছে এবং চারপাশের ঝোপঝাড়ের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে। এরপরও খুব কম লোকই এমন রয়েছে, যারা গন্তব্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছে এবং আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা হিসেবে চূড়ান্তভাবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। অধিকাংশ লোক যে গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে তা আল্লাহকে অস্বীকার করার গোমরাহী নয় বরং শিরকের গোমরাহী। অর্থাৎ তারা আল্লাহ নেই একথা বলে না বরং তারা আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও অধিকারে অন্যদেরকে কোন না কোনভাবে অংশীদার করার বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। পৃথিবী ও আকাশের বিভিন্ন নিদর্শন, যেগুলো সর্বত্র সর্বক্ষণ আল্লাহর একক সার্বভৌম কর্তৃত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, সেগুলোতে যদি শিক্ষণীয় দৃষ্টিতে দেখা হতো তাহলে কোনদিন এ বিভ্রান্তির জন্ম হতো না।

৭৭. লোকদেরকে সতর্ক করাই এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অবকাশ জীবনকে দীর্ঘতর মনে করে এবং বর্তমানের শান্তি ও নিরাপত্তাকে চিরস্থায়ী ভেবে পরিণামের চিন্তাকে ভবিষ্যতের জন্য শিকেয় তুলে রেখো না। কোন ব্যক্তিই নিশ্চয়তা সহকারে একথা বলতে পারে না যে, তার জীবনকাল অমুক সময় পর্যন্ত অবশ্যি স্থায়ী হবে। কাকে হঠাৎ কখন গ্রেফতার করা হবে এবং কোথা থেকে কি অবস্থায় তাকে ধরে আনা হবে তা কেউ জানে না। তোমাদের দিনরাতের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, ভবিষ্যতের গর্ভে তোমাদের জন্য কি লুকানো আছে তা এক মুহূর্ত আগেও তোমরা জানতে পার না। কাজেই যা কিছু চিন্তা করার এখনই করে নাও। জীবনের যে পথে এগিয়ে যাচ্ছো তার ওপর সামনে অগ্রসর হবার আগে ঠিক পথে যাচ্ছো কিনা একটু থেমে চিন্তা করে দেখো। এটা যে সঠিক পথ, এর সপক্ষে কোন যথার্থ দলীল তোমাদের কাছে আছে কি? বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনাবলী থেকে এর সত্যসঠিক পথ হবার কোন প্রমাণ পাচ্ছো কি? তোমাদের স্বজাতীয় লোকেরা এ পথে চলে ইতিপূর্বে যে ফল লাভ করেছে এবং বর্তমানে তোমাদের সমাজ সংস্কৃতিতে এর যে ফলাফল দেখা যাচ্ছে তা কি একথাই প্রমাণ করে যে, তোমরা সঠিক পথে যাচ্ছো?

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣعَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ
وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ۭ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي
الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ وَلَدَارُ
الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۭ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿١٠٩﴾

তাদেরকে পরিষ্কার বলে দাও ঃ আমার পথতো এটাই, আমি আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি নিজেও পূর্ণ আলোকে নিজের পথ দেখছি এবং আমার সাথীরাও। আর আল্লাহ পাক–পবিত্র[৭৮] *এবং শির্ককারীদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।*

হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে আমি যে নবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই মানুষই ছিল, এসব জনবসতিরই অধিবাসী ছিল এবং তাদের কাছেই আমি অহী পাঠাতে থেকেছি। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্বে যেসব জাতি চলে গেছে তাদের পরিণাম দেখেনি? নিশ্চিতভাবেই আখেরাতের আবাস তাদের জন্য আরো বেশী ভালো যারা (নবীর কথা মেনে নিয়ে) তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেছে। এখনো কি তোমরা বুঝবে না?[৭৯]

৭৮. অর্থাৎ তাঁর প্রতি যেসব কথা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা থেকে তিনি পাক–পবিত্র। যেসব দোষ, ত্রুটি, অভাব ও দুর্বলতা প্রত্যেক মুশরিকী আকীদার ভিত্তিতে তার প্রতি অনিবার্যভাবে আরোপিত হয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এমন সব দোষ, ত্রুটি ও ভুল–ভ্রান্তি থেকেও মুক্ত যেগুলো শিরকের ফলশ্রুতি হিসেবে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়।

৭৯. এখানে একটি বিরাট বিষয়কে দু'তিনটি বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। একে যদি কোন বিস্তারিত বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় তাহলে এভাবে বলা যেতে পারে ঃ "তারা যে তোমার কথার প্রতি দৃষ্টি দেয় না, তার কারণ হচ্ছে এই যে, কালকে যে ব্যক্তির জন্ম হলো তাদেরই শহরে এবং তাদেরই সামনে সে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্যে পৌছুলো, তার ব্যাপারে তারা কেমন করে একথা মেনে নেবে যে, একদিন হঠাৎ আল্লাহ তাকে নিজের দূত হিসেবে নিযুক্ত করেছেন? কিন্তু এটা কোন নতুন কথা নয়। দুনিয়ায় আজ প্রথমবার তাদেরকেই এর মুখোমুখি হতে হয়নি। এর আগেও আল্লাহ দুনিয়ায় নবী পাঠিয়েছেন। তাঁরা সবাই মানুষই ছিলেন। সেখানেও কখনো অকস্মাত কোন শহরে কোন অপরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেনি এবং তিনি একথা বলেননি যে, তাঁকে নবী নিযুক্ত করে পাঠানো হয়েছে। বরং মানবতার সংস্কার ও সংশোধনের জন্য যাদেরই আবির্ভাব হয়েছে তারা সবাই সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিজস্ব

حَتّٰۤی اِذَا اسۡتَیۡـَٔسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوۡۤا اَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِبُوۡا جَآءَهُمۡ نَصۡرُنَا ۙ فَنُجِّیَ مَنۡ نَّشَآءُ ؕ وَ لَا یُرَدُّ بَاۡسُنَا عَنِ الۡقَوۡمِ الۡمُجۡرِمِیۡنَ ﴿۱۱۰﴾ لَقَدۡ كَانَ فِیۡ قَصَصِهِمۡ عِبۡرَۃٌ لِّاُولِی الۡاَلۡبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِیۡثًا یُّفۡتَرٰی وَ لٰكِنۡ تَصۡدِیۡقَ الَّذِیۡ بَیۡنَ یَدَیۡهِ وَ تَفۡصِیۡلَ كُلِّ شَیۡءٍ وَّ هُدًی وَّ رَحۡمَۃً لِّقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ ﴿۱۱۱﴾

(আগের নবীদের সাথেও এমনটি হতে থেকেছে। অর্থাৎ তারা দীর্ঘদিন উপদেশ দিয়ে গেছেন কিন্তু লোকেরা তাদের কথা শোনেনি।) এমনকি যখন নবীরা লোকদের থেকে হতাশ হয়ে গেলো এবং লোকেরাও ভাবলো তাদেরকে মিথ্যা বলা হয়েছিল তখন অকস্মাত আমার সাহায্য নবীদের কাছে পৌঁছে গেলো। তারপর এ ধরনের সময় যখন এসে যায় তখন আমার নিয়ম হচ্ছে, যাকে আমি চাই তাকে রক্ষা করি এবং অপরাধীদের প্রতি আমার আযাব তো রদ করা যেতে পারে না।

পূর্ববর্তী লোকদের এ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। কুরআনে এ যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো বানোয়াট কথা নয় বরং এগুলো ইতিপূর্বে এসে যাওয়া কিতাবগুলোতে বর্ণিত সত্যের সমর্থন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ,[৮০] আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত।

এলাকার ও জনবসতির লোকই ছিলেন। ঈসা, মূসা, ইবরাহীম, নূহ আলাইহিমুস সালাম কারা ছিলেন? যেসব জাতি তাঁদের সংস্কারের আহবান গ্রহণ করেনি এবং নিজেদের ভিত্তিহীন কল্পনা বিলাসিতা ও নিয়ন্ত্রণহীন কামনা বাসনার পিছনে দৌড়াতে থেকেছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে তোমরা নিজেরাই দেখে নাও। তোমরা নিজেদের বাণিজ্যিক সফরসমূহে আদ, সামুদ, মাদয়ান ও লূত জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার ওপর দিয়ে যাওয়া আসা করছো। সেখানে কি তোমরা কোন শিক্ষা পাওনি? দুনিয়ায় তারা এই যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে এটিই তো এ খবর দিয়ে যাচ্ছে যে, আখেরাতে তাদের পরিণাম হবে এর চেয়ে আরো বেশী ভয়াবহ। আর যারা দুনিয়ায় নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে তারা কেবল দুনিয়ায়ই ভালো থাকেনি, আখেরাতেও তাদের পরিণতি এর চেয়ে আরো অনেক বেশী ভালো হবে।"

৮০. অর্থাৎ মানুষের হেদায়াত পাওয়া ও পথ দেখার জন্য যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ। কেউ কেউ "প্রত্যেকটি জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ"

শব্দাবলী থেকে অযথা সারা দুনিয়ার সমস্ত জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ অর্থ করেন এবং এরপর কুরআনে উদ্ভিদ বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ না পেয়ে পেরেশান হয়ে পড়েন।